নববর্ষ।

১

নববর্ষ পুনঃ এলো—হও আগুয়ান!
ধর্ম্মবর্ম্মে ঢাকি দেহ দুর্ব্বল পরাণ॥
সুনব বসন পর, আবিলতা পরিহর,
মাথার উপরে যিনি—তিনি কর্ণধার।
সাহসে বাঁধিয়া বুক, হও অগ্রসর॥

২

নবীন ডাকিল ভাই! হও আগুয়ান।
সংসারের বর্ত্ম নহে কুসুম-সমান॥
সাবধানে ফেল পদ, জননীর আশীর্ব্বাদ;
নিশ্চয় বর্ষিবে শিরে হও আগুয়ান।
সংসারের পথ নহে কুসুম-সমান॥

৩

নববল লভ সবে নবীন জীবন।
বিধির চরণে কর সর্ব্বস্ব অর্পণ॥
ভীরু প্রাণ! সাধ হরি, সাহসের বর্ম্ম পরি,
নবীন সাধনা লয়ে হও আগুয়ান।
বিধির করুণা শিরে হবে বরষণ॥

৪

বিধির করুণা শিরে হবে বরষণ।
এ ভারত তপোবন, নহেত স্বপন॥
সেই তপোবন-ছায়ে কতই কোকিল গাহে।
আবিলতা ধুয়ে সব হও আগুয়ান।
এ ভারত তপোবন—নহেত স্বপন॥

নববর্ষ।

নববর্ষের নূতন দিনে আজ পৃথিবীর কি অনির্ব্বচনীয় শোভা! আজ আর কেহ পুরাতনে আকৃষ্ট নহে, সকলেই নূতন সাজে সজ্জিত হইতে ব্যস্ত; সকলেই পুরাতন মলিনতাকে নূতনের উজ্জ্বল বেশে সাজাইতে ব্যগ্র। আজ সকলের মুখে একই কথা। ভাই সকল—আজ বৎসরের প্রথম দিন, আজ আর নিরানন্দ থেকো না। মনে কোন মলিনতা কুটিলতাকে স্থান দিও না, ভগবানের নাম গ্রহণ ক'রে আজ নূতন সাজে সজ্জিত হও, হৃদয়কে নূতন বলে বলীয়ান্ কর, হৃদয়ে সাধু সঙ্কল্প ধারণ করিয়া দৃঢ় পদে সংসারপথে অগ্রসর হও। আজ বৎসরের প্রথম দিন যে ভাবে কাটাইবে, সারা বৎসরের তাহাই ভূমিকা স্বরূপ হইয়া থাকিবে। অতএব আজ বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া যাও, প্রাণের অশান্তি দূর করিয়া শান্তির জন্য লালায়িত হও, পুরাতন বৎসরের দুঃখময় স্মৃতি সকল বিস্মৃত হইয়া নূতন সাজে সজ্জিত হও। এই মঙ্গলময় দিনে যে দিকেই দৃষ্টি করা যায়, সর্ব্বত্রই যেন এক আনন্দময় সজীবতা অনুভূত হয়। ঐ ক্ষুদ্র হইতে ধনীর গৃহ পর্য্যন্ত, ঐ সামান্য মুদীর দোকান হইতে বিশাল পণ্যশালা পর্য্যন্ত আজ সকলেই মধুর প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের সারা বৎসরের মলিনতা দূর করিতে ব্যস্ত, সকলেই সাধ্যমত তাহাদের ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র শক্তিতে নিজেদের মলিনতা দূর করিয়া পবিত্রতা সুখ অনুভব করিতেছে। তাহাদের হৃদয়ে এত আনন্দ কেন, তাহারা সকলে নিজেদের দ্বারে দ্বারে আজ মঙ্গল-ঘট স্থাপন করিয়াছে কেন—তাহারা জানে আজই আগামী নূতন বর্ষের সূচনা, আজি-কার দিনের উপর সারাটী বৎসর নির্ভর করিতেছে।

আমাদেরও ক্ষুদ্র জীবনে আজ একটী নববর্ষের সমাগম দর্শন করিলাম। এক এক করিয়া কত বৎসর আসিল, কত বৎসর চলিয়া গেল, আরও অনন্ত কালে কত বৎসর যাইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁহার সৃষ্ট ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম পিপীলিকা দ্বারাও জগতের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। এই ক্ষুদ্র প্রাণী জানে না যে, তাহা দ্বারা পৃথিবীর কি মহৎ কল্যাণ সাধিত হইতেছে, কিন্তু সে অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাইতেছে. তাহার কার্য্যের ফলাফল সেই ঈশ্বরের হাতেই আছে।

আমাদের জীবনের আজ আর এক নূতন অধ্যায়। অতীতের আলোচনা করিতে গেলে গত ৪৬ বৎসরের মধ্যে কত যে সুখ দুঃখ, আনন্দ বিষাদের মধুর ও কঠোর স্মৃতি হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত কঠিন পরীক্ষাজাল ভেদ করিয়া এই ক্ষুদ্র শক্তি সেই মহাশক্তির টানে আপনার কঠোর কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিয়াছে. তাহা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নিকট নির্নীত হইতেছে, ইহার ফলাফলের ভার তাঁহারই উপর। আমাদের সে বিষয় ভাবিবার কোন অধিকার নাই, কেবল কর্ত্তব্য সাধন করাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আজ এই নূতন বর্ষের দিন আমরা অতীত মলিনতার কথা মনে রাখিব না, আমাদের ক্ষুদ্র দেহকে নূতন সাজে সজ্জিত করিয়া হৃদয়ে নূতন বলের জন্য সর্ব্বশক্তি-মানের নিকট শক্তি ভিক্ষা করি। হে ভগবন্! তুমি আমাদের এই ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা যে সামান্য কল্যাণ সাধিত করিতেছ, তাহাতে তোমারই কৃপা জয়যুক্ত হউক। যে সাধু উদ্দেশ্য মস্তকে বহন করিয়া আমরা পুনরায় আর এক বর্ষ ঘুরিয়া আসিলাম, তৎসাধনার্থ যেন আজিকার নূতন উৎ-সাহে দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া তোমারি জগতের কল্যাণকার্য্যে ব্রতী হইতে পারি। আমরা যেন জীবনের কঠিন পরীক্ষায় ভীত হইয়া কর্ত্তব্যসাধনে পশ্চাৎপদ না হই। তোমারি প্রতি কেবল লক্ষ্য রাখিয়া আমরা যেন কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারি। তুমি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত—আগামী জুন মাস হইতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বরোদা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইবেন।

শোকসংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, কাকিনার সদাশয় রাজা মহিমারঞ্জন রায় কিছুদিন যাবৎ আমাশায় রোগে কষ্ট পাইয়া মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

গত ৫ই এপ্রিল সোমবার মেট্রপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ মিঃ এন্ এন্ ঘোষ মহাশয় বেরি বেরি রোগে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। শিক্ষাবিভাগে ইনি একজন উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন।

দান—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্থায়ী ফণ্ডে শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় ২০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বড়লাট লর্ড মিণ্টো পঞ্জাবের শিখ স্বর্ণমন্দিরদর্শনকালে, তত্রত্য প্রধান পুরোহিতের হস্তে ১০০০৲ মুদ্রা দান করিয়াছেন।

কলিকাতায় রামমোহন রায় লাইব্রেরির সাহায্যার্থ কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ২০০ দুই শত টাকা দান করিয়াছেন এবং ময়মনসিংহের সুবিখ্যাত জমিদার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী ৫০০ পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন।

বোমার মামলা—১২৬একশত ছাব্বিশ দিনের দীর্ঘ বিচারের পর বোমার মামলার আসেসারগণ শ্রীযুক্ত বাবু অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়কে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন,এবং ধৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে নয় জনকে মাত্র দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। আলিপুরের জজ বাহাদুর রায় প্রকাশ করিতে আরও একমাস লাগিবে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষোন্নতি সভা—গত ১২ই এপ্রিল, কলিকাতা টাউনহলে, বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার জন্য যে সকল ছাত্র উক্ত সভা হইতে বৃত্তি ও পাথেয় পাইয়া বিদেশ যাত্রা করিবেন, তাহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। এ বৎসর প্রায় ১০০ শত ছাত্র উক্ত সভা হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া বিদেশ যাত্রা করিয়াছেন। ভগবান্ ইঁহাদের সাধু-সঙ্কল্পের সহায় হউন।

সামাজিক সংস্কারের আবশ্যকতা*।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

বিধবাবিবাহের অপ্রচলনে সমাজে যে ভ্রূণহত্যাদি পাপপরম্পরা সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা সেই স্বর্গীয় মহাত্মা জলন্ত অক্ষরে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কেবল

(১) ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনী পত্রিকায় বিধবা-বিবাহ বিষয়ে একটী উপাদেয় প্রস্তাব প্রকাশিত

একটী কথার উল্লেখ করেন নাই। সে কথাটী জানাইতেছি। মধ্যে মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ভারতের বিভিন্ন জাতির যে লোকসংখ্যার তালিকা প্রকাশ করিতেছেন, তদ্দর্শনে ভারতে হিন্দুসংখ্যার ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, জানা যায়। বিধবাবিবাহের অপ্রচলন এই সংখ্যাহ্রাসের অন্যতম কারণ বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। সংখ্যাক্ষয় যে জাতীয় শক্তিক্ষয় তাহাও অনেকে বুঝিতেছেন। ভগবৎকৃপায় সম্প্রতি এ দেশে এ বিষয়ে একটী অপূর্ব্ব সুলক্ষণ দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি। আমাদের পরমশ্রদ্ধাস্পদ, অদ্ভুতপ্রতিভাশালী, বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অবতার, মহামান্য হাইকোর্টের জজ শ্রীমান্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় নিজ বালিকা বিধবা কন্যাটীকে সুপাত্রে পুনর্বিবাহ দিয়া, যে নির্ভীকতা, সৎসাহস ও মহত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভারতের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে। বঙ্গদেশে পুণ্যশ্লোক ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহতী সাধনার এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ফল দর্শন করিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত না হইবে? অধিকতর সুখের বিষয় যে, শ্রীমান্ আশুতোষের এই শুভ কার্য্যে এ দেশের বহু গণ্য, মান্য, সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ এবং বরণীয় পণ্ডিতমণ্ডলী সানন্দে যোগ দিয়াছেন। এ কার্য্যের জন্য মহাত্মা আশুতোষ বঙ্গবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। আশুতোষ সামান্য ব্যক্তি নহেন। বিদ্যায়, প্রতিভায়, জাতি ও কুলমর্য্যাদায় লোকপ্রতিষ্ঠায়, চরিত্রগৌরবে, রাজসম্মানে, পদগৌরবে, সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। গণিতশাস্ত্রের নব নব তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া তিনি পাশ্চাত্য জগৎকেও চমকিত করিয়াছেন। তাঁহার পিতৃদেব ৺ পুণ্যশ্লোক গঙ্গাপ্রসাদ বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। তাঁহাকে সকলে "দীনতারণ দয়াময় গঙ্গাপ্রসাদ" বলিত। সহস্র সহস্র উপকৃত লোকের কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তিনি দেবতারূপে পূজিত। আশুতোষের মাতৃদেবী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। এমন পিতামাতা না হইলে কি এমন রত্ন সম্ভবে? শ্রীমান্ আশুতোষের এ সদনুষ্ঠানের কয়েক মাস পূর্ব্বে আলিপুর কোর্টের সর্ব্বপ্রধান উকিল শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ মহোদয় নিজ বালিকা বিধবা কন্যাটীর উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দিয়া, হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রেরই ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথও সামান্য ব্যক্তি নহেন। কুল, শীল, পদ, মর্য্যাদা, বিদ্যা ও পুণ্যশীলতায়, দেবেন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ"—সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যে সদাচারের অনুষ্ঠান করেন, সমাজের

হইয়াছে। সরল কথায় এমন সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। এই প্রবন্ধের লেখিকা—সাগরদাঁড়ী-নিবাসিনী, বামাকুলরত্ন, অপূর্ব্ব প্রতিভাশালিনী শ্রীমতী মানকুমারী। ইনি কাব্যকুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ এবং লোকহিতকর বহুল গদ্য প্রবন্ধ রচনা দ্বারা সাহিত্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিতা। তাঁহার প্রবন্ধটি পড়িতে সকলকে অনুরোধ করি।

বা, বো, স।

অন্যান্য লোকেরা তাহারি অনুবর্ত্তন করে। অতএব নিম্নশ্রেণীমধ্যে লক্ষ দৃষ্টান্তের যে ফল না হইবে, এইরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দৃষ্টান্তে তাহার সহস্র গুণ অধিক ফললাভ হইবে। বোম্বে ও মান্দ্রাজ প্রদেশের কতিপয় মহাত্মা এ শুভ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে ভগবৎকৃপায় বঙ্গদেশও আত্মমর্য্যাদা-রক্ষণে উন্মুখ হইল, ইহা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদা, বলপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যে প্রবর্ত্তিতা, বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহেরই আমি পক্ষপাতী। যাঁহাদের পতি-মর্য্যাদা জ্ঞান হইয়াছে, যাঁহারা দীর্ঘকাল পতিসৌভাগ্য ভোগ করিয়াছেন, যাঁহারা পুত্রবতী, প্রৌঢ়বয়স্কা, আমি সে সকল বিধবার পুনর্ব্বিবাহের আদৌ পক্ষপাতী নহি। সর্ব্বাবস্থায় সকল বয়সের বিধবাদিগের যদি পুনর্ব্বিবাহের দ্বার উন্মুক্ত হয়, তবে প্রকৃত দাম্পত্যপ্রেমের ব্যাঘাত ও সংসারে নানা বিশৃঙ্খলা ও অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

আর এক ভীষণ মহাপাপ আমাদের সমাজে দৃষ্ট হয়। উহার নাম বধূনিগ্রহ। বিবাহের পর বধূগণকে পিতৃগৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শ্বশুরগৃহের আশ্রয় লইতে হয়। পরের কন্যা আজন্মপরিচিত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি প্রাণারাম আত্মীয়বর্গের স্নেহময় ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, অপরিচিত পরিবারমধ্যে আসিয়া, নীড়বিচ্ছিন্ন বিহঙ্গশিশুর ন্যায় অবরুদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে শ্বশুরকুলের আশ্রয়ে জীবন শেষ করিতে হইবে। কিছু-দিন পরে, তাহারি উপর সমস্ত পরিবারের ভার পতিত হইবে। উক্ত পরিবারের ভদ্রাভদ্র এই নববধূর চরিত্রের উপর নির্ভর করিতেছে। একেত সমাজের বর্ত্ত-মান অবস্থায় কন্যাগণের যথোচিত শিক্ষার অভাব, তদুপরি পরগৃহের রীতি, নীতি, রুচি ও প্রকৃতি প্রভৃতির বিষয়ে নববধূর কোনও জ্ঞান থাকারই সম্ভাবনা নাই। এজন্য, পদে পদে বধূগণের নানা ত্রুটির সম্ভাবনা। এ স্থলে ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা সহকারে, কোমলভাবে, স্নেহার্দ্র হৃদয়ে বধূমাতাকে গড়িয়া লওয়াই শ্বশুরকুলের কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা সকল কার্য্যে খুঁটিনাটি ধরিয়া তাহাকে নিপীড়ন করা পিশাচের কার্য্য। কিন্তু নিরতিশয় ক্ষোভের বিষয় যে, এ বিবেচনা অনেক ভদ্রপরিবারেও দৃষ্ট হয় না। বোধ হয়, অশিক্ষিতা শ্বশ্রূ ও ননন্দা প্রভৃতিরা মনে করেন, এ বধূ স্বামীকে বশ করিয়া লইবে, ক্রমে আমরা 'পর' হইব। এরূপ একটা কল্পনা করিয়া তাঁহারা নিরপরাধা বালিকা বধূগণের উপর নানা অত্যাচার করিয়া থাকেন। কোনও কোনও স্থলে অত্যাচার এত ভীষণ হয় যে, বধূরা সে যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া থাকেন। এরূপ লোমহর্ষণ ঘটনার কথা বিরল নহে। ইহা ভাবিলেও মর্ম্মবেদনায় বিহ্বল হইতে হয়, সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়, মনে হয়, ধরণী বিদীর্ণা হউক, এ দেশ রসাতলে প্রবেশ করুক।

যে দেশের শাস্ত্রানুশাসন ;—"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"—ত্রিভুবনে

স্ত্রীজাতিমাত্রই সেই বিশ্বজননী ভগবতী মহাশক্তির 'কলা' অর্থাৎ অংশ। এজন্য স্ত্রীজাতিকে সকলে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিবে। "অবধ্যাং চ স্ত্রিয়ং প্রাহুস্তির্য্যগ্‌-যোনিগতামপি"—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি তির্য্যক্‌যোনির স্ত্রীজাতিরাও অবধ্য। হায়! আজি সেই দেশের স্ত্রী-জাতির এ দুর্দ্দশা! আমরা ইংরাজের নিকট তাঁহাদের সমানাধিকার লাভের জন্য উৎসুক। এরূপ অধিকার প্রার্থনা বা কামনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের তদনুরূপ সমাজসংস্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। যে যাহা পাইবার উপযুক্ত হয়, সে তাহা পাইয়া থাকে, ঈশ্বরের ব্যবস্থা এইরূপ।

লোকসমাজের মূলবন্ধন ধর্ম্ম। ভগবান্ ভীষ্মদেব লোকস্থিতির মূলতত্ত্ব কীর্ত্তন করিবার সময় প্রথমেই,—"নমো ধর্ম্মায় মহতে ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ"—এই মহা-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যে মহান্ 'ধর্ম্ম' এই লোকমণ্ডলীকে ধারণ করে, তাহাকে নমস্কার! এই মূল ছাড়িয়া আমরা যে কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব, তাহা নির্ম্মূল হইবে। আমাদের আত্মায় ধর্ম্মবল বদ্ধমূল এবং সেই সঙ্গে পুরুষকার সমঞ্জসভাবে (ধর্ম্মের অবিরোধে) মিলিত না হইলে, আমরা কদাচ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব না। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন ;—

"নাব্রহ্ম ক্ষাত্রমৃধ্নোতি নাক্ষাত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষাত্রং চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥"

—ধর্ম্মবলশূন্য বাহুবলের স্থায়ী বিকাশ হয় না, বাহুবলশূন্য ধর্ম্মবলেরও স্থায়ী বিকাশ হয় না। অবিরোধী ভাবে এ উভয়ের অচ্ছেদ্য সংযোগই চিরস্থায়িনী সমুন্নতির মূল।

"অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলং তু বিনশ্যতি॥"

—অধর্ম্মের সম্পদ্ প্রথমে বাড়িতে পারে, তাহাতে আপাততঃ সুখসম্ভোগ ও শত্রুজয় প্রভৃতি ঘটিতে পারে, কিন্তু শেষে সমূলে নিপাত।

যখন যখন যে যে সমাজ, ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়াছে, সেই সেই সমাজ বিনষ্ট হইয়াছে। যে যে রাজ্যে বাহুবল ধর্ম্মবলকে অতিক্রম করিয়াছে, সেই সেই রাজ্য ধ্বংস পাইয়াছে। অদ্বিতীয় বীর নেপো-লিয়ন্ বোনাপার্ট সেণ্ট হেলেনায় কারাবাস-কালে বলিয়াছিলেন ;—"আলেক্‌জাণ্ডার, সীজার, শার্লমান্ ও আমি,—আমরা সকলেই সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলাম ; কিন্তু আমাদের রাজ্যের মূলভিত্তি বাহুবল, তাই আমাদের রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হইল, কিন্তু যিশুখৃষ্ট সনাতন ধর্ম্মবলের উপর রাজ্য স্থাপন করায়, তাঁহার প্রেমের রাজ্য অক্ষয় হইয়াছে। অহো! বিশুদ্ধ সনাতন, আনন্দময় প্রেমের রাজ্য এবং আমাদের এই জ্বালাময়, ক্ষণভঙ্গুর ভৌতিক রাজ্য; উভয়ের কত প্রভেদ!"

স্বদেশীয়গণমধ্যে এই দুই বলের সমঞ্জস ভাবে গাঢ় প্রতিষ্ঠাই প্রকৃত শিক্ষা ও প্রকৃত সমাজসংস্কার। প্রাচীন আর্য্যগণ—আমা-দের সেই ব্রহ্মদর্শী মহর্ষিগণ, যে সমাজকে

আদর্শরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন. ধর্ম্মই তাহার মূল। অর্থ ও কাম ধর্ম্মমূলেই প্রতিষ্ঠিত, এজন্য অর্থ ও কাম ধর্ম্মেরই অঙ্গ। কিন্তু আমরা ঠিক তাহার বিপরীত পথে চলিয়াছি। ধর্ম্মকে মূল না করিয়া, কামকে মূল করিয়াছি। এজন্য আমাদের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম না হইয়া, ধর্ম্মের ভানমাত্র বা কামের সহায়, এবং আমাদের অর্থ, অর্থ না হইয়া, অনর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা কূল ছাড়িয়া অকূলে পড়িয়াছি, পথ ছাড়িয়া অপথে চলিয়াছি। একমাত্র মূল ছাড়িয়াই আমরা নির্ম্মূল হইতেছি। আমাদের এ দশা অপাপের ফল।

সমস্ত সমাজের ভদ্রাভদ্র শিক্ষাপ্রণালীর উপর নির্ভর করে। এজন্য সমাজসংস্কার বলিলে, শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার বুঝিতে হয়। এ দেশে যে প্রণালীতে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহাকে এক কথায় ধর্ম্মহীন শিক্ষা বলিলে বোধ হয় অন্যায় বলা হয় না। "আচারলক্ষণো ধর্ম্মঃ,"—সদাচারই ধর্ম্মের লক্ষণ। অন্তঃশৌচ বা ভাবশুদ্ধি এবং বহিঃশৌচ বা সমস্ত বাহ্যপদার্থাদির বিশুদ্ধতা সম্পাদন—এ দুইটী, সদাচারের প্রধান অঙ্গ। এখনকার বিদ্যালয়ে সে শিক্ষার সম্ভাবনা নাই। "ধর্ম্ম" শব্দে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম, আমার উদ্দেশ্য নহে। শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক, সামঞ্জস্যভাবে এই ত্রিবিধ শিক্ষার পূর্ণতাই আমার উদ্দেশ্য। ধর্ম্মশাস্ত্রকার ভগবান্ বিষ্ণু শিক্ষা বিষয়ে সংক্ষেপে বড় সার কথাটী বলিয়াছেন। যথা;—

"বহির্মুখানি স্রোতাংসি কৃত্বা চান্তর্মুখানি হি।
ভক্তি ধ্যানং চ জ্ঞানং চ শেষস্তু গ্রন্থবিস্তরঃ।

আচার্য্য শিষ্যগণের বহির্মুখী ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলিকে অন্তর্মুখী করিয়া দিবেন; এইরূপ শিক্ষাই শিষ্যের প্রকৃত জ্ঞানলাভ। এই আত্মানুভূতি ও আত্মপ্রসাদ, যাহাতে লাভ করা না যায়, সে সকল উপদেশ ও গ্রন্থরাশি আবর্জনামাত্র। একমাত্র ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাবই সমাজের অশেষ অনর্থ-পরম্পরার নিদান। রাজকীয় বিদ্যালয় প্রভৃতিতে প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার আশা করা যায় না। গৃহই ধর্ম্মশিক্ষার স্থান। সমাজও গৃহসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। 'ধর্ম্ম' শব্দে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম আমার অভিপ্রেত নহে। যাহা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে এক অদ্বৈত, অবিকারী মহাসম্মিলনে আকর্ষণ করিতেছে, যে স্পর্শমণির প্রভাবে মানব পশুভাবনির্ম্মুক্ত হইয়া, দেবভাব প্রাপ্ত হয়, সমস্ত বিশ্ববাসীর হৃদয় অদ্বৈত, ও অভেদ্য সদ্ভাবসূত্রে গ্রথিত হইয়া, সেই প্রেমসাগরে গিয়া মিলিত হয়, আমি সেই বিশ্বস্তর মহীয়ান্ ধর্ম্মের কথা বলিতেছি। "In Memorium" নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যার এক স্থানে মহাজ্ঞানী কবিবর টেনিসন লিখিয়াছেন,—"There is an intimate connection between the human and the Divine, each individual will have a spiritual and eternal significance with relation to other individual wills as well as to the Supreme and Eternal will."

—জীবে ও ঈশ্বরে এ নিগূঢ় সম্বন্ধ এবং পরমাত্মার সহিত সম্মিলনে জীবের মহা-নির্ব্বাণের কথা, বেদান্তাদি শাস্ত্রে অথবা যুক্তি দ্বারা এ দেশে বহুকালপূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু হায়! জ্ঞান-ভাণ্ডারের সাররত্ন, আধ্যাত্মিক বিভূতির চরমোৎকর্ষ, সে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবিদ্যা আজি অতীত ইতিহাসের গর্ভে। সুশিক্ষার সাধন—সদ্‌গুরু ও সাধুসঙ্গ। দেবত্ব বা পশুত্ব মানবের শিক্ষাধীন। সঙ্গই উন্নতি বা অবনতির কারন। সাধুসঙ্গে যেমন উন্নতি, অসৎসঙ্গে তেমনি অধোগতি।

(ক্রমশঃ)

কাশ্মীর।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

এইরূপে রাত্রি যাপন করিয়া অতি প্রত্যুষে আমরা ডাকবাঙ্গালার প্রাপ্য চুক্তি করিয়া দিয়া, টঙ্গায় আরোহণ করিলাম। তখনও জ্যোৎস্না আছে। সমস্ত নিঃশব্দ—কেবল স্রোতস্বিনী বিতস্তার অবিরাম কলনাদ শ্রুত হইতেছিল। সন্নিকটেই একটি লৌহসেতু। সেতুর নিকট-বর্ত্তী হইবামাত্র একজন চৌকীদার এবং একজন হিন্দুস্থানী কেরাণী শুল্ক চাহিল। আমরা কালবিলম্ব না করিয়া ১৲ টাকা করিয়া টঙ্গার মাশুল দিলাম। টঙ্গা অবাধে সেতু পার হইয়া কাশ্মীররাজ্যে পড়িল। এতক্ষণ আমরা ব্রিটিস রাজ্যে ছিলাম, এই-বার প্রকৃত হিন্দুরাজ্যে পড়িলাম। অনেক কথা মনে পড়িল, কাশ্মীরের প্রাচীন হিন্দু-রাজ্যের কথা, তাহার পর বহুশতবর্ষব্যাপী মুসলমান-রাজত্বের কথা, হিন্দুরাজ্যের পুনরভ্যুত্থান, প্রথম শিখ যুদ্ধের পর দূর-দর্শী রাজা গোলাপসিংহ কর্ত্তৃক ইংরাজের নিকট হইতে রাজ্যক্রয়, আবার হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি কাশ্মীরের পরিবর্ত্তনশীল ইতিহাস-পটের ভিন্ন ভিন্ন চিত্রাবলী মানস-পটে উদিত হইতে লাগিল।

পুল পার হইবামাত্র কাশ্মীর রাজ্যের জনৈক কর্ম্মচারী পুনর্ব্বার মাশুল প্রার্থনা করিল, এবার ১৷৷৹ টাকা করিয়া মাশুল দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। টঙ্গা দ্রুত-বেগে অবাধে নিজ গন্তব্য স্থানে পর্ব্বত-গাত্রাবলম্বী পথে ধাবমান হইল। এই রাস্তা এত পরিষ্কার, এত অল্পে অল্পে উচ্চ হইয়াছে যে, আমরা পাহাড়ের উপর দিয়া চলিতেছি তাহা বোধই হয় না। কত পাথর কাটিয়া, কত নির্ঝর বাঁধিয়া এই রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইয়াছে এবং ইহার রক্ষার জন্য কত অর্থব্যয় ও কত বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে, তাহা মনে করিলে, কাশ্মীরাধিপতির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এক এক স্থানে পাহাড় এমনই কঠিন যে, সে স্থানে টনেল করিয়া পথ করিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। আমরা

যাইতে যাইতে এই রকম দুইটি টনেল পার হইলাম। ডোমেল নামক স্থানে আসিয়া পুনরায় মাশুল দিলাম। এই স্থানটি কৃষ্ণ-গঙ্গা ও বিতস্তার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। একটি ক্ষুদ্র বাজার ও একটি সরাই আছে। রাস্তার একটু নিম্নে মহারাজের বিশ্রাম-ভবন ও ডাকবাঙ্গালা। ডাকবাঙ্গালা বেশ সাজান। নিকটেই একটি তারের সাঁকো। এই সাঁকো পার হইয়া অবটা-বাদের পথ গিয়াছে।

প্রায় বেলা ১১টার সময় আমরা ঘরি নামক স্থানে পৌছিলাম। বাজারে আসিয়া টঙ্গার ঘোড়া খুলিয়া দিল। আমরা নিকটস্থ কোনও ছায়াবহুল বৃক্ষের তলে পাক করিবার স্থানান্বেষণ করিতেছি, এমন সময়ে একটি দোকানদার বলিল, আপনারা যদি হিন্দু-আহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ডাকবাঙ্গালার চত্বরের অপর পার্শ্বে মহারাজার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি হিন্দুহোটেল আছে, আপনারা সেখানে আহার করিতে পারেন। কলি-কাতার বিষ্ণুঠাকুর দ্বারা পরিচালিত হিন্দু-হোটেলের আচার স্মরণে হোটেলে যাইতে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমার বন্ধু বলিলেন, "একবার দেখিয়াই আসা যাউক না কেন? যদি নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন হয়, তাহা হইলে না খাইলেই ত চলিবে; রান্না ত পড়িয়া রহিয়াছে।" আমি তাঁহার কথাটা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া, ডাকবাঙ্গালার অভিমুখে গমন করিলাম। বাজারের অতি নিকটেই মহারাজার বিশ্রামাগার, তাহার পার্শ্বেই ডাকবাঙ্গালা। সম্মুখেই বিতস্তা। এখানে বিতস্তায় নামিবার একটি বাঁধা ঘাট আছে। বাঙ্গালাটি বেশ বড় ও সাজান। ভিতরে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ-মধ্যে বড় বড় মহীরুহ। এক পার্শ্বে বাবুর্চি-খানা। অপর পার্শ্বে হিন্দুদিগের পাক-স্থান। যে সকল পথিক ডাকবাঙ্গালায় বিশ্রামকালে মুসলমানস্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন না, তাহাদিগের জন্য মহারাজা পৃথক্ করিয়া হিন্দু পাকশালার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে যে কত সুবিধা হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

পাকশালায় গিয়া দেখি, মিশ্রঠাকুর হাতাহস্তে বিরাজমান, অতি মিষ্টবাক্যে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমরা বৈষ্ণবী খানা খাইব, কি শাক্ত-খানা খাইব, অর্থাৎ নিরামিষ, কি আমিষ ভোজন করিব? আমরা উভয়ের মূল্য এবং তারতম্য কি জিজ্ঞাসা করিলে, মিশ্র-ঠাকুর একটি ছাপান খাদ্যের তালিকা হস্তে দিলেন। তাহাতে নানাবিধ আহার-সামগ্রীর কথা আছে। তালিকাটি মহা-রাজার সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট কর্তৃক প্রস্তুত। আমরা বৈষ্ণবীখানার আদেশ দিলাম। তত্রত্য একটি হিন্দুপরিচারক একটি ষ্টালের খাটিয়া পাতিয়া দিল। আমরা তাহাতে বস্ত্রাদি খুলিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

পাকশালায় দুইটী ঘর—একটি, রসুই করিবার, অপরটী ভোজন করিবার। দুই ঘরই পরিষ্কার। পাক আগে হইতে করা

থাকে না—ফরমাইস হইলে তৎক্ষণাৎ করিয়া দেয়।

পরিচারক মহাশয় বড় বড় পিতলের ঘড়ায় করিয়া স্নানের জল গরম করিতে লাগিলেন। আমরা স্নানাদি সমাপন করিলে ঠাকুর মহাশয় অতি পরিষ্কার রৌপ্য-বিনিন্দিত জার্মন সিলভারের থালায় করিয়া খাবার আনিলেন। দেখিলাম ঠাকুরজি পোলাও, ভাত, দুই রকম ডাল, ভাজা, নিরামিষ ডাল্না ও টক্ রাঁধিয়াছেন। তাহার উপর আবার দধি, জিলেপী ও পেঁড়া দিয়া আহার সমাপন করা গেল। রান্না অতি পরিপাটি এবং যত্ন অপরিসীম। আমরা অতি সন্তুষ্ট হইয়া আহারের মূল্য ৸৹ আনা এবং ঠাকুর ও ভৃত্যের বক্‌সিস দিয়া বিদায় হইলাম। যাইবার সময় ঠাকুর বলিয়া দিলেন যে, যেখানে বড় ডাকবাঙ্গালা আছে, সেই-খানেই এই প্রকার আহারের ব্যবস্থা আছে। পূর্ব্ব হইতে তার করিলে আরও নানাবিধ আহার্য্য সে প্রস্তুত করিতে পারে।

অনন্তর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে আমরা বেলা ২ টার সময় টঙ্গায় আরোহণ করিলাম। টঙ্গা অবাধে গন্তব্যপথে চলিতে লাগিল। প্রাকৃতিক দৃশ্য ক্রমশই সুন্দরতর হইতে লাগিল। পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, অনন্ত দুর্ভেদ্য শৈলমালা; নিম্নে বিপুলবেগা হুঙ্কারকারিণী বিতস্তা—পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে দুরারোহ গিরিশ্রেণী। কোথাও বা সেই সকল পর্ব্বতমালা তৃণশষ্পশূন্য নগ্ন, কোথাও বা নিবিড়-নীলপাদপরাজি-মণ্ডিত; আবার কোথাও শৈলগুহা হইতে লতাকুঞ্জ ভেদ করিয়া জলপ্রপাত স্তরে স্তরে পথপ্রান্তে আছড়িয়া পড়িতেছে। এইরূপে পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা রাত্রি ৭ টার সময় উরি নামক ডাকবাঙ্গালায় উপস্থিত হইলাম। আমরা একটি গৃহ দখল করিলাম। এ বাঙ্গালাটিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং এখানেও মিশ্র-ঠাকুর-পরিচালিত হিন্দুহোটেল আছে। রাত্রে এখানে অধিক শীত বোধ হইল। প্রভাতে উঠিয়া টঙ্গা ছাড়িয়া দিলাম। পথ নিতান্ত আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। বাঁক পার না হইলে রাস্তা দেখা যায় না—গিরি-সঙ্কটের মধ্যে যেন লুকাইয়া গিয়াছে; এক একটি পর্ব্বত এক এক রকম বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। কোথাও বা ক্রোশ ব্যাপিয়া ঘনসন্নিবিষ্ট দেবদারুবন,—কোথাও বা চীর বৃক্ষের জঙ্গল, আবার কোথাও বা চিনার বৃক্ষরাজি। বুঝি এই বিবিধ-পাদপসজ্ঝ-পরিব্যাপ্ত ভূধরমালা ফুরাইবার নহে। এই সকল স্থানে বিতস্তার গর্জ্জন বড় গভীর, বেগ অত্যন্ত প্রবল এবং ইহা রাজপথ হইতে বহু নিম্নে। এই নয়নানন্দ-কারী মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিলাসক্ষেত্রে—পর্ব্বতের ক্রোড়ে, লতা-কুঞ্জের মধ্যে একটু ক্ষুদ্র সমতল ক্ষেত্রের উপর একটি বহুপ্রাচীন, শৈবালমণ্ডিত, দেবালয়ের ভগ্ন স্তূপ দৃষ্ট হইল। মন্দিরের প্রবেশদ্বার ও মধ্যের প্রকোষ্ঠ এখনও বিদ্যমান আছে এবং মন্দিরে উঠিবার বড়

বড় পাথরে গাঁথা সোপানশ্রেণী ইহার পূর্ব্বগৌরব সূচিত করিতেছে। টঙ্গাচালক এই মন্দিরের নাম 'পাণ্ডুগৃহ' বলিল।

কিংবদন্তী আছে যে, পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতায় মিলিয়া কাশ্মীরে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। মহাভারতে দৃষ্ট হয় যে, মহাবীর ধনঞ্জয় রাজসূয়যজ্ঞকালে এই প্রদেশ জয় করেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে এই প্রদেশের শাসনদণ্ড কিয়ৎকাল গ্রহণ করেন। গ্রীক ভৌগোলিক টলেমিও লিখিয়াছেন যে, পাণ্ডবদিগের রাজ্য বিতস্তার তীরে অবস্থিত *। এ হেন সুন্দর প্রদেশ যে "পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহা প্রাচীন হিন্দুদিগের প্রাণে সহ্য হইত না. কাযেই পাণ্ডবদিগের আসা চাই। যদি পাণ্ডবেরা বাসই করিল, যে দেশ বাহুবলে জিত হইল তাহাতে দুই চারিটা মন্দির, বা কীর্ত্তিস্তম্ভ বা দেউল থাকা সম্ভব নহে কি? বিশ্বাস অবিশ্বাস করা পাঠক-পাঠিকার হাতে। আমি যাহা দেখিলাম বা শুনিলাম তাহা বলিয়াই খালাস। এই ভগ্ন মন্দির হইতে কয়েক ক্রোশ যাইলেই রামপুর নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লী। এখানে একটি কাঠের কারখানা আছে। বিতস্তার প্রবল বেগ দ্বারা একটি যন্ত্র চালিত হইতেছে, তাহাতে একটি করাত সংলগ্ন আছে, তদ্দ্বারা বড় বড় কাষ্ঠ সকল চিরেট হইতেছে। রামপুর অতিক্রম করিলে আর একটি জীর্ণ ভগ্ন দেবালয় দেখিতে পাইলাম। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ভূধরশ্রেণী তত ঘন সন্নিবিষ্ট ও তদুপরিস্থিত জঙ্গল আরও গভীর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। লৌসেরায় ক্ষুদ্র গ্রাম ছাড়াইলাম, একটি উইলো গাছ বেষ্টিত শস্যপূর্ণ উপত্যকায় পড়িলাম। পাহাড় সকল ক্রমে দূরে পড়িয়া গেল, বিতস্তার ভীষণ বেগ ক্রমশঃই মন্দীভূত দেখিলাম। আমরা বরামূলা নামক একটি ক্ষুদ্র নগরীতে উপস্থিত হইলাম। বরামূলা বিতস্তার তীরে। এখানে নদীর আর সে তেজ নাই, বেশ প্রশস্ত—দুই পার্শ্বে শ্যামল ধান্যক্ষেত্র, তাহার পশ্চাতে অভ্রভেদিনী পর্ব্বতমালা। কি সুন্দর দৃশ্য! বিতস্তা উলর হ্রদের মধ্য দিয়া শ্রীনগর দিয়া প্রবাহিতা।

অনেকে বরামূলায় টঙ্গা ত্যাগ করিয়া জলপথে শ্রীনগর যাত্রা করেন। জলপথে শ্রীনগর যাইতে তিন চারি দিন লাগে। বিতস্তার তীরে একটি সুন্দর ডাকবাঙ্গালা আছে ও তথায় পূর্ব্বকথিত হিন্দুদিগের আহারের বন্দোবস্ত আছে।

এখানে নানাবিধ নৌগৃহ (হাউস্ বোট) ভাড়া পাওয়া যায়। যাঁহারা জলপথে শ্রীনগর যাইবেন, তাঁহারা এই স্থানে নৌগৃহ ভাড়া করিবেন।

এই সকল নৌকা প্রায় ৩০।৪০ হাত লম্বা ও ৭।৮ হাত প্রশস্ত। আমাদের দেশের নৌকার ন্যায় ইহাদের তলা গোল নহে, —চেটাল; এই জন্য নৌকা হেলে না, বা

* Circa antem Bidaspum Pandovorum regio. i. e. the kingdom of the Pandus is upon the Bitasta.

দোলে না, স্থির থাকে। এইরূপ নৌকাতে সচারাচর ৩।৪টি প্রকোষ্ঠ থাকে, সকল প্রকোষ্ঠই ব্যবহারোপযোগী করিয়া সাজান, তবে আবশ্যক হইলে নিজ ব্যয়ে আসবাব ক্রয় করিত বা ভাড়া লইতে হয়। হাউস্‌-বোটে রন্ধন করিবার প্রায় ব্যবস্থা থাকে না, তাহার জন্ত পৃথক নৌকা ভাড়া লইতে হয়। এ সকল নৌকায় খড়ের ছাউনি ছুইটি ঘর থাকে; একখানি রাঁধিবার জন্ম, অপরটি চাকর থাকিবার জন্ম। এই রকম বোটকে ডঙ্গা বলে।

হাউসবোটগুলা বড় ভারী, শীঘ্র যাইতে পারে না, গুণ টানিয়া বা লগী মারিয়া চালাইতে হয়, সুতরাং শীঘ্র গমনাগমনের জন্ত লম্বা সরু ছিপের ন্যায় নৌকা রাখিতে হয়। এই নৌকাকে শীকারা বলে; লম্বায় ২০।২৫ হাত, পরিসর প্রায় ২।৩ হাত; আরোহীর বসিবার স্থান লঘু কাষ্ঠ অথবা হোগলা দিয়া ছাওয়া—ইচ্ছামত খুলিয়া ফেলা যায়। শীকারা "বোটে" দিয়া বাহে। কাশ্মীরের জলপথই অধিক, সুতরাং কলিকাতায় যেমন সৌখীন ঘরের গাড়ি, বা ভাড়াটে গাড়ি আছে, সেখানেও সুন্দর ঘরের শীকারা ও ভাড়াটে শীকারা আছে।

ধনী ব্যক্তিরা উৎকৃষ্ট-পরিচ্ছদ-পরা দাঁড়িমাঝিযুক্ত, নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্র, শোভিত হাউস্‌-বোট ও শিকারা রাখে। ভূতপূর্ব্ব বড়লাটপত্নী লেডিকর্জ্জন যে শীকারায় চড়িতেন, তাহা ৬০ জন সুন্দর-পরিচ্ছদপরা কাশ্মীরী স্ত্রীলোক দ্বারা বাহিত হইত। একটি হাউস্‌-বোটের মাসিক ভাড়া ৩০।৪০ টাকা হইতে ৫০০ টাকা। ইহা ব্যতীত দাঁড়ি মাঝির বেতন স্বতন্ত্র দিতে হয়।

আমরা যখন বরামূলায় পৌছিলাম, তখন বেলা ১১টা। সেদিন সে স্থানে আহারাদি করিয়া রাত্রিযাপনানন্তর প্রত্যূষে শ্রীনগর যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমরা শ্রীনগর পৌছিতে এত উৎসুক হইয়াছিলাম যে, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়াই পুনরায় টঙ্গা-রোহণে যাত্রা করিলাম। প্রায় ২৯ মাইল যাইয়া হুষ্কগঙ্গা নদীর উপরস্থ পুল পার হইলাম। ইহার পর হইতে বরাবর শ্রীনগর পর্য্যন্ত বিখ্যাত "পপ্‌লার এভিনিউ"—প্রশস্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে ঘনসন্নিবিষ্ট, সরল, অত্যুন্নত পপ্‌লার অর্থাৎ সফেদী বৃক্ষ সারি দিয়া সাজান। এ প্রকার এভিনিউ ভারতের কোন স্থানে নাই। ক্রমে প্যারেড ময়দান, স্ত্রীলোকদিগের হাঁসপাতাল, কার্পেটের কারখানা ইত্যাদি ছাড়াইয়া শ্রীনগর রাজ-ধানীর প্রথম সেতু 'আমিরা কদলের' নিকট টঙ্গা নামাইয়া দিল। কাশ্মীর-রাজধানী আসিবার বৈচিত্র্যপূর্ণ রমণীয় কিন্তু ক্লান্তিকর পথ এইখানে শেষ হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনৃপেন্দ্র নারায়ণ দত্ত।

বালিকা-শিক্ষা।

মঙ্গলময় বিধাতা আমাদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন ও আমাদিগের সুখের নিমিত্ত সম্মুখে তাঁহার অমৃতভাণ্ডার খুলিয়া রাখিয়াছেন। পবিত্র হৃদয়, মন ও আত্মা যদ্দ্বারা তাঁহার অমৃতভাণ্ডারের সুধা লাভ করিয়া আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারি, তৎসমুদয়ই তিনি দান করিয়াছেন। তাঁহার অপরিসীম করুণার সীমা কোথায়!

তিনি আমাদিগের সর্ব্ববিধ সুখসাধনের জন্য মানবজাতিকে স্ত্রী ও পুরুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেককে উপযুক্ত গুণ ও ক্ষমতা দিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন। প্রত্যেকেরই বিভিন্ন প্রকারের শক্তি, গুণ ও তদনুযায়ী কার্য্য আছে। একের কার্য্য অন্য দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। তাহাদের নিজ নিজ কার্য্য সম্পূর্ণ পৃথক্।

বালক-জীবন হইতে যেমন পুরুষগণ নিজ কার্য্যক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে থাকে, বালিকাদিগেরও শৈশবাবধি তদ্রূপ নিজকার্য্যোপযোগী শিক্ষালাভ করা আবশ্যক। সেই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" অর্থাৎ কন্যাকে পালন করিবেক ও অতি যত্নের সহিত বিদ্যাশিক্ষা দিবেক। আমাদের দেশের পুরাকালের স্ত্রীজীবন আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে এ দেশে স্ত্রীলোকের জ্ঞানচর্চ্চার যথেষ্ট আদর ছিল। বচক্নু মুনির কন্যা গার্গী, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী ও অত্রি-মুনির কন্যা আত্রেয়ীর ব্রহ্মসাধনার দৃঢ়তার বিষয় অনেকেই জানেন।

শুধু ব্রহ্মসাধনার জন্য নহে, আবার অনেকে লোকহিতৈষিতার জন্য চিরস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। বিদুষী লীলাবতী, খনা ও ভানুমতীর বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। কারণ এখনও গৃহে গৃহে খনার বচন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বিক্রমাদিত্যপত্নী ভানুমতী এরূপ বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য অনেক সময় তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধিযুক্ত পরামর্শ-প্রভাবে অনেক সঙ্কট ও রাজনৈতিক অশান্তির হস্ত হইতে মুক্ত হইতেন। জটিল রাজ্যতন্ত্রবিষয়ক মন্ত্রণাস্থলে মহিষীকে সতত উপস্থিত থাকিতে হইত এবং তাঁহার পরামর্শ গৃহীত হইত। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা জগতে বিখ্যাত। এই সভাতে সকলেই ভানুমতীর বিদ্যাবুদ্ধির অশেষ প্রশংসা করিতেন। এই অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহাদের সংক্ষেপ বর্ণনা ব্যতীত বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব।

তখন স্ত্রীলোকগণ অনেক সময় পুরুষদিগের সহিত এক চতুষ্পাঠীতে পড়িতে পারিতেন। মহর্ষি বাল্মীকিমুনির আশ্রয়ে থাকিয়া আত্রেয়ী লব-কুশের সহিত একত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, তৎকালে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত ছিল।

স্বয়ম্বরপ্রথাও চলিত ছিল। ইহা যে স্ত্রী-স্বাধীনতামূলক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি সাধ্বী রমণীগণ জগতে অলৌকিক সচ্চরিত্রতার প্রভাব দেখাইয়া মানবমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এরূপ সতী সাধ্বী, বিদ্যাবতী ও ধর্ম্মশীলা নারী ছিলেন বলিয়া আজও পূজিতা হইতেছেন।

বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতের নারীজাতির চরিত্র ও বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় আলোচনা করিলে, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বিদ্যাবুদ্ধি, কেহ ব্রহ্মজ্ঞান, কেহ স্বদেশের হিতসাধন, কেহ বা আত্মমর্য্যাদার জন্য ইতিহাসে জলদক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেশে, বিদেশে কীর্ত্তিত হইয়া এখনও মানবমণ্ডলীকে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন করিতেছে।

গৃহকার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, সন্তানপালন, গৃহকার্য্যক্ষম স্ত্রীলোক ব্যতীত পুরুষের দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে না। তাঁহারা যেমন সন্তানদিগের সর্ব্ববিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন, পুরুষ তাহা পারে না; এজন্য জ্ঞানিগণ গৃহকে স্ত্রীলোকের রাজ্যবিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে তিনি রাণীর ন্যায় রাজত্ব ও প্রভুত্ব করেন। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত গৃহরাজ্যের কোন কাজই সুশৃঙ্খলভাবে ও সুনিয়মে চলে না। সেই জন্যই সকল দেশের জ্ঞানিগণ বলেন যে, যে গৃহের রাণী যে পরিমাণে সুশিক্ষিতা ও কর্ম্মশীলা, সেই গৃহ সেই পরিমাণে উন্নত। যে গৃহের রাণী জ্ঞান ও বিদ্যালঙ্কৃতা ও ধর্ম্মশীলা, সেই গৃহের পুরুষ ও সন্তানসন্ততিবর্গ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সদ্ভাবে ও সুখশান্তিতে জীবন কাটাইতে পারে। গৃহকর্ত্রী যদি অপবায়িতা, অলসতা প্রভৃতি দোষে দূষিত হন, তাহা হইলে গৃহকর্ত্তার সুখ স্বচ্ছন্দতা ও প্রাণের শান্তি লাভ করা ত দূরের কথা, সন্তানসন্ততিবর্গ পর্য্যন্ত তজ্জনিত ক্লেশ ও অসুখ ভোগ করিয়া নিজেরাও সেই সকল দোষের হস্ত হইতে মুক্ত থাকিতে পারে না। সেই জন্যই সকল দেশের জ্ঞানিগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, স্ত্রীলোকের বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ববিধ গৃহকার্য্যে সর্ব্বাঙ্গীণ নৈপুণ্য লাভ করা অতি আবশ্যক।

বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ না করিলে যেমন হৃদয় মন উন্নত হয় না, পারিবারিক সুখ শান্তি থাকে না, সন্তানগণ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ গৃহকার্য্যে সুদক্ষা না হইলে অভাব, অনাটন ও বিশৃঙ্খলতাহেতু নানা পাপ আশ্রয় করে। তজ্জন্যই বলিতেছি, স্ত্রীলোকের বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জন যেমন একদিকে প্রয়োজনীয়, গৃহকর্ম্মে উন্নতি লাভ করাও তেমনি আবশ্যক।

সন্তানপালন, সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার ও সকলকে সদ্ভাবে পালন করিতে যেমন উচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজন, গৃহে সুশৃঙ্খলভাবে ও সদ্ভাবে সমস্ত কার্য্য পরিচালন করিয়া সকলকে সুখশান্তিতে রাখিতে ও পরিবারের উন্নতি সাধন করিতে

সেইরূপ সুদক্ষতার প্রয়োজন। এই সকল কার্য্য স্ত্রীলোক দ্বারাই সুসম্পন্ন হয় বলিয়া, শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন;—

"স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন"

অর্থাৎ গৃহে স্ত্রীতে আর শ্রীতে (লক্ষ্মীতে) কোন প্রভেদ নাই। তাঁহারা আরো বলিয়াছেন—"সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা।" যিনি গৃহকার্য্যে দক্ষা তিনিই ভার্য্যা।

বস্তুতঃ, গৃহকর্ম্মে নৈপুণ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে বালিকাগণ বিদ্যা ও জ্ঞানালোচনা যত করিতে পারে, ততই মঙ্গল। গৃহে গৃহে বালিকাগণের এরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত যেন তাহারা সুকন্যা, সুমাতা ও সুগৃহিণী হইতে পারে। বালিকাবয়স হইতে যাহাতে তাহাদের হৃদয়ের কোমল ও মধুর গুণগ্রাম বিকশিত হয়, সুচারুরূপে সংসারধর্ম্ম পালন ও সন্তানের সুশিক্ষাদানোপযোগিনী শক্তি লব্ধ হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। মানবশক্তির বিকাশের ক্ষেত্র—গৃহ। এই গৃহকে মানবশিক্ষার উপযুক্ত করিতে হইলে বালিকাগণের প্রকৃত শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষিতা করা প্রয়োজন। বাল্যকাল হইতে কন্যাদিগকে ঈশ্বরপরায়ণা, সাধ্বী, সুনিপুণা গৃহিণী, স্নেহময়ী কর্ত্তব্যপরায়ণা জননী ও পতিপরায়ণা স্ত্রীর আদর্শ দ্বারা শিক্ষাদান করিলে সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষালাভের পক্ষে সহায়তা হইতে পারে।

ইহা সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বত্র স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিদ্যালাভ, জ্ঞানার্জন ও গৃহকার্য্যে নৈপুণ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে যদি ধর্ম্মভাবের যোগ না থাকে, তবে তাহা প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। কারণ, ধর্ম্মপ্রণোদিত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, ধর্ম্মলাভ করাই প্রকৃত সুশিক্ষা এবং ধর্ম্মযুক্ত কার্য্যই প্রকৃত কার্য্য।

পরমপিতা পরমেশ্বর আমাদিগের আশ্রয় এবং শক্তি। অভাব ও বিপদের সময় তিনি আমাদিগকে সর্ব্বদাই সাহায্য করিতেছেন ও উদ্ধার করিতেছেন। তাঁহার করুণার উপর নির্ভর করিয়া আমরা কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইলে নিশ্চয়ই সফলকাম হইব। তাঁহার চরণে আমাদিগের এই প্রার্থনা যে, প্রতিগৃহে প্রকৃতরূপে বালিকাদিগের সুশিক্ষাদানের প্রথা প্রচলিত হউক। বালিকাগণ প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার কন্যানামের উপযুক্ত হইয়া ধন্য হউক।

বি, সেন, গৌহাটী।

শ্রাদ্ধবাসরে শোকার্ত্তা কন্যার প্রার্থনা।

হে দয়াময়! আজি সর্ব্বাগ্রে তোমায় আমরা স্মরণ করি; কারণ এতদিন আমরা তোমাকে ভুলেছিলাম। ভুলেছিলামই বলিব, কারণ এতদিন আমরা যে ভাবে

তোমাকে ডাকিতাম, সে ডাকা ত ডাকাই নয়। সে যে মৌখিক চিৎকার, সে ত প্রাণের ডাক নয়।

যেমন শিশু খাবার পেলে আর তার মার কাছে খাবার জন্য কাঁদে না, অভ্যাস বশতঃ এক একবার মা মা বলে ডাকে; কিন্তু যদি তাহার খাবার সামগ্রী কাড়িয়া লও, কিংবা তাতে যদি তার ক্ষুধানিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলেই সে ডাক ছেড়ে কাঁদবে। আমরাও তেমনি তোমার প্রদত্ত সুখ সৌভাগ্য পেয়ে ভুলেছিলাম, এক একবার অভ্যাস বশতঃ তোমাকে ডাকতাম। তুমি তাই দেখলে যে এদের এরকম করে রাখ্‌লে হবে না। মা তাঁর মন্দ সন্তানকে যে প্রহার করেন, তিরস্কার করেন, সে সব সন্তানের মঙ্গলের জন্য। আবার সন্তান যখন আর দোষ করিব না বলে কেঁদে আকুল হয়, তখন কি মা আর থাকতে পারেন? মা যাকে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে প্রহার করেছেন, তিরস্কার করেছেন, সেই সন্তানকে কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করিতে আরম্ভ করেন। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!

হে বিশ্বজননি! তুমি তাই আমাদের দুর্দশা দেখে আমাদের শাসনের জন্যই আজ এই পবিত্র দিনে বৎসরের প্রথমেই আমাদের উপর এই প্রহার আরম্ভ করিলে। আমরা যাঁকে সকলের অপেক্ষা বেশি ভাল বাসতাম, যাঁর উপর সকল নির্ভর করিতাম, যাঁর কোলে আশ্রয় নিয়ে সকল দুঃখ যন্ত্রনা ভুলে যেতাম; তুমি সেই আমাদের চির সুখের স্থান স্নেহময়ী জননীর ক্রোড় হতে আমাদিগকে চিরদিনের জন্য দূর করে দিলে। আমরা দিশাহারা হয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম, শান্তিলাভ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। সেই মাতৃস্নেহ পাবার জন্য আকুল হয়ে বেড়াতে লাগলাম, প্রাণ শূন্য, হৃদয় শূন্য, চতুর্দ্দিক্‌ শূন্য দেখ্‌তে লাগ্‌লাম, প্রাণে একটুও শান্তি পাই না, সুখ পাই না, কোথায় গেলে প্রাণ জুড়ায় জানি না, যখন আমাদের এইরূপ অবস্থা, হে বিশ্বজননি! হে জননীর জননি! তখন তুমি মানবরূপ তোমার দূত দ্বারা তোমার ঐ শান্তিময় নাম আমাদের প্রাণে ঢালিয়া দিলে। তখন তোমার নাম আমাদের কাছে কি মধুর লাগ্‌ত! যখন শোকে তাপে, বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় স্নেহময়ী জননীর ক্রোড় হতে দূরে পড়ে আকুল হয়ে কাঁদ্‌তাম, শূন্য প্রাণে যখন চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখ্‌তাম, অবলম্বনহীন হয়ে যখন আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, হে জননীর জননি! আমরা তখন তোমার নামরূপ ঐ আশ্রয় পেয়ে, ঐ ক্রোড়লাভ করে প্রাণে কি আরাম পেয়েছি! কি শান্তিসুখ লাভ করেছি! যদি সহস্র বর্ষ তুমি আমাদের পিতামাতার সঙ্গে এ পৃথিবীতে বাস করিতে দিতে, তাহা হইলেও বোধ হয়, ওরূপ সুখ শান্তি পেতাম না। তাই আজ সর্ব্বাগ্রে তোমার নাম স্মরণ করে, তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি—মঙ্গলময়ি! বিশ্বজননি! বৎসরের প্রথম দিনে তুমি যে জন্য আমাদিগকে এই প্রহার

করিলে, শাসন করিলে, তাহা যেন আমাদের জীবনে বিফল না হয়। আমাদের মাতৃহীন করেছ, কিন্তু তুমি যে ঐ মার মা হয়ে স্নেহ হস্ত প্রসারণ করে আমাদের কোলে তুলে নেবার জন্য দাঁড়াইয়া রয়েছ আমরা যেন তাহা দেখ্‌তে পাই এবং তোমার ক্রোড় লাভ করিবার জন্য যেন তোমার পথে অগ্রসর হই।

মা! মাগো! স্নেহময়ি জননি আমার! আজ সংবৎসর পূর্ণ হ'ল যে, মাগো! তোমার ক্রোড় হতে বঞ্চিত হয়ে দূরে পড়ে আছি। এ জীবনে আর যে কখনও তোমার স্নেহ ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিব, সে আশাও ত নাই। তবে কি কেবল কাঁদিতে কাঁদিতে এ জীবন অবসান করিব? তা নয়, আজ আর আমরা চোখের জল ফেলিব না। আজ আমাদের এরূপভাবে ক্রন্দন করিবার দিন নয়। ক্রন্দন ত চিরদিন আছে, ক্রন্দন ত জীবনের সাথি হয়েছে, তবে আজ তাকে এত আদর করে অভ্যর্থনা করিবার আবশ্যক কি? আজ ক্রন্দন দূর হয়ে যাক্, আজ চক্ষের জল শুষ্ক হয়ে যাক। আজ আর বাহিরের কিছু আড়ম্বর যেন আমাদের থাকে না। আজ আমরা এই মাতৃহীন সন্তান তোমার! ভক্তির সহিত তোমার চরণে প্রণত হয়ে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করছি, ক্ষমা ভিক্ষা করছি, তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ কর, ক্ষমা কর। এত দিন তোমাদের চরণে যে সকল অপরাধ করেছি, যে সকল অন্যায় করেছি, তোমাদের শুভ ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলেছি, সে সকল দোষ ক্ষমা কর। এই নূতন বর্ষের নূতন দিনে আমরা প্রাণে এই সঙ্কল্প করি যে, তোমরা যাহা ভালবাসিতে, তোমরা যাহা আমাদের জীবনে দেখিতে ইচ্ছা করিতে, আমরা যেন তাহাই হইতে ও সেই পথে চলিতে চেষ্টা করি। ভগবান্ এইদিনে আমাদের এই শাস্তি দিয়েছেন, এই জন্য যে, আমরা আজ এই সুখের দিনে পার্থিব সুখ সকল ত্যাগ করে যাহা অপার্থিব, যা অক্ষয়, তাহাই লাভ কর্‌ব। আজ আর আমরা তোমাদের জন্য কি করব, শুধু চক্ষের জল ফেলব? তাহলেই কি তোমাদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ হবে? তা নয়, তোমরা ত আমাদের নিকটে রয়েছ! এই আমাদের সঙ্গে এখানে বসেছ! বসে বলছ,—প্রিয় সন্তানেরা—তোমরা দুঃখ কর না, ক্রন্দন কর না, আমরা তোমাদের নিকটেই আছি। এখন তোমরা সেই কাজ কর, যাহা আমরা ভালবাসিতাম। যাহা তোমাদিগকে অনন্তের দিকে নিয়ে যাবে, তোমরা সেই পথে চল ও অগ্রসর হও। আজ যেমন এই ভাব প্রাণে উপলব্ধি করছি, মাগো! এ পৃথিবীতে যতদিন থাকিব, ততদিন যেন প্রাণে এই ভাব থাকে। তোমাদের যে সকল সদ্‌গুণ ছিল, সে সকলের অধিকারী হয়ে এ বংশের ও আমাদের জীবনের সার্থকতা করি। তোমার চরণে ভক্তির সহিত প্রণত হয়ে এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

দয়াময়! আজ এই শ্রাদ্ধবাসরে আর কি

প্রার্থনা করিব ? এতদিন যাঁহাদের আশ্রয়ে সুখভোগ করছিলাম, যাঁহারা মানবজীবনে সকল সুখের স্থান, সেই পিতা মাতা, উভয় হইতেই তুমি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করেছ। এখন তোমার চরণে এই প্রার্থনা করি যেন তোমার চরণ হতে বিচ্ছিন্ন না হই, এবং আমাদের সেই স্বর্গগত ও স্বর্গগতা জনক-জননীর সদ্‌গুণ লাভ হতে যেন বঞ্চিত না হই। তুমি আমাদিগকে তাঁদের উপযুক্ত সন্তান কর প্রভু! আমাদের জীবনে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। ওঁ ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্‌, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

কমলার পুরস্কার।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

সুনীলকুমার বার বার এই পত্রখানি পড়িতেছেন। মন বড়ই প্রফুল্ল। জীবনে বহু পরিশ্রম করিয়া একে একে বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি পার হইয়া শেষে এই ডেপুটী-গিরি পরীক্ষা দিয়াছেন, তাহাতেও জয় নিশ্চয়। পরীক্ষার গুরু পরিশ্রমে কতজনের স্বাস্থ্য হানি হয়, কিন্তু সুনীলকুমারের স্বাস্থ্য অটুট, অব্যাহত। সুস্থ দেহ, সুস্থ মন; নিকট ভবিষ্যতে এক দিকে উচ্চ বেতন ও সম্ভ্রমের রাজপদ, অন্য দিকে সাক্ষাৎ কমলার ন্যায় কমলাকে গৃহলক্ষ্মীরূপে লাভ, এরূপ অবস্থায় তাঁহার মন উৎফুল্ল হইবে না কেন ? ভাবী পত্নীর রচিত এই অকিঞ্চৎ-কর পদ্যটীতে অপরের দৃষ্টিতে কোন কবিত্ব না থাকিলেও তাঁহার নিকট কবিতাময়। "দাও তাঁরে—মন আর কিছু নাহি চায়।" এই এক ছত্রেই শত মহাকাব্যের মাধুর্য্য মনে হইতেছে। তিনি চক্ষু মুদিয়া আসন্ন মিলনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

সহসা কে দ্বারে আঘাত করিল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। আঘাতকারীকে ঘরে আসিবার অনুমতি দিলেন। ভৃত্য তাঁহার হস্তে একখানি চকচকে, স্থূল সুগঠন লেফাপা দিয়া প্রস্থান করিল। তিনি তাড়াতাড়ি পত্রখানি খুলিলেন। পত্রখানি ইংরাজিতে; অতি সুন্দর কাগজে সুন্দর টাইপ রাইট করা। পত্রের সঙ্গে দুই খণ্ড বহু পুরাতন গলিতপ্রায় হস্তলিপি। তিনি আগে ইংরাজি পত্রখানি পাঠ করিলেন। উহার ভাবার্থ এই;—

"প্রিয় সুনীলকুমার বাবু,

আমি শুনিলাম, আপনার পিতা নাকি ৺—র কন্যা কমলার সহিত আপনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। এরূপ শুভ কার্য্যে বাধা দেওয়া বড়ই আক্ষেপের কথা। কিন্তু পরোপকার করাই আমাদের প্রকৃতি; বিশেষতঃ আপনি আমাদের দেশের একটী রত্ন। একজন কুলটার গর্ভজাত কন্যা আপনার অঙ্কলক্ষ্মী হইবে ইহা আমার অসহ্য। যে দুই খণ্ড পত্র আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি, তাহাতে দেখিবেন যে পাপিনী নিজ হস্তে তাহার

প্রেমপাত্রকে পত্র লিখিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে। আমরা জানি শুধু সে কুলটা নহে, স্বামিহন্ত্রীও বটে। স্বাক্ষর যাহার তাহার নহে, দেশের একজন গণ্যমান্য জমীদারের।"

সুশীলকুমারের সংজ্ঞা প্রায় লোপ পাইল। হাত হইতে কাগজগুলি পড়িয়া গেল। কোনও ক্রমে সেগুলি তুলিয়া ছিন্ন ভিন্ন ঐ দুই খণ্ড কাগজ পড়িলেন। উহাতে লেখা ছিল—

(১) * আমি প্রিয়তম * আপনার সম্মত হইয়াই কার্য্য করিলাম। আমার সর্ব্বস্ব আপনার হাতে * আর কি বাকি রহিল? * *

(২) * রাত্রি দুই প্রহরের সময় আপনি নদীর পর পারে অপেক্ষা করিবেন। আমি * আপনার সহিত * অবশিষ্ট অংশগুলি গলিত ও অপাঠ্য। এই দুই খণ্ড যে একখানি পত্রেরই বিভিন্ন দুই অংশ ও উহা যে কমলার জননীরই হস্তাক্ষর সে সম্বন্ধে সুশীলকুমারের কোন সন্দেহ রহিল না। সুশীলকুমার কমলার মাতার হস্তাক্ষর বেশ চিনিতেন। তাঁহার মন আলোড়িত হইল। মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু জ্ঞান আর আসিল না। তিনি উন্মত্ত হইলেন। পিতা এই পত্র দৃষ্টে পুত্রের উন্মত্ততার কারণ বুঝিতে পারিলেন।

ডাক্তারী, কবিরাজি, হাকিমী, কত চিকিৎসাই হইল, কিন্তু রোগের উপশম হইল না। চিকিৎসকেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে বায়ু পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিলেন। সুশীলকুমার বায়ুপরিবর্ত্তনার্থে ওয়াল্টারে গেলেন। মাতা সঙ্গে রহিলেন এবং কতিপয় আত্মীয় ব্যক্তিও রহিলেন।

সুশীলকুমার সর্ব্বদা অন্যমনস্ক, সর্ব্বদা অস্থির। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। মধ্যে মধ্যে নিজে অতি মৃদুস্বরে কি বলেন, কেহই বুঝিতে পারে না। "কমলা" "সর্ব্বনাশ" "সুন্দর কবিতা" প্রভৃতি দুই চারিটি কথা মাত্র লোকে বুঝিতে পারিত। পুত্রের এবম্বিধ ভাব দর্শনে মাতার বিষাদের পরিসীমা রহিল না। তিনি দর-বিগলিত-ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিতেন, এবং যুক্তকরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন, "ভগবন্! আমার সুশীলকে ভাল কর! তাহার পূর্ব্ব স্মৃতি-শক্তি ফিরাইয়া দাও।"

(৫)

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥"

গত রাত্রিতে সুশীলকুমারের ভগিনীপতি অতুল বাবু নিজ স্ত্রী এবং পুত্র কন্যাসহ ওয়াল্টারে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। রাত্রিতে তিনি নিজ আগমনবার্ত্তা সুশীলকুমারকে জানান প্রয়োজন মনে করেন নাই। তিনি প্রাতঃকালে সুশীলকুমারের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার অবস্থা এখনও সেইরূপ শোচনীয়ই রহিয়াছে, তাঁহার মুখ-শ্রী মলিন ও বিকৃত, পরিচ্ছদ

বিপর্য্যস্ত ও কেশ রুক্ষ। একখানি চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর একখানি কাগজে কি ছাই ভস্ম দাগ দিতেছেন। অতুলবাবু ফুল-ভূষণে ভূষিতা নিজ শিশু কন্যাটীর হাত ধরিয়া, সুশীলের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুশীলকুমার ঐ দাগে পূর্ণ কাগজটীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বা! কি সুন্দর কবিতা!"

সুশীলকুমারের ভাবদর্শনে অতুলবাবু বড়ই দুঃখিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অতিকষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন,—"সুশীল!" নিদ্রোত্থিতের ন্যায় সুশীল প্রথমে অতুলবাবুর প্রতি, পরে নিজ ভাগিনেয়ীর প্রতি শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। পরে অধোবদনে মৌনভাবে অনেকক্ষণ গেল। সেই ক্ষুদ্র বালিকা সুশীলকুমারের বস্ত্রাগ্র ধরিয়া, কখনও বা ডান হাত ধরিয়া আধ আধ স্বরে কত কথা বলিল। সুশীলকুমার অতুলবাবুর দিকে চাহিলেন। এবার তাঁহার দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত, তেমন ফ্যালফেলে ভাব নাই। করুণদৃষ্টিতে অতুলবাবুর দিকে চাহিয়া মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে বলিলেন,—"অতুলবাবু,—ফুলভূষণে ভূষিতা এই দেবকন্যাকে আপনি কোথা হইতে আনিলেন?" অতুলবাবু দুঃখিত ও বিস্মিত হইলেন। বুঝিলেন সুশীলের বিকারাবস্থা এখনও অপগত হয় নাই। বলিলেন,—"সুশীল, দেবকন্যা কোথায়? এ যে তোমার ভাগিনেয়ী অমিয়া! অমিয়া ফুল বড় ভাল বাসে, তাই তোমার ভগ্নী স্বর্ণালঙ্কার অপেক্ষা ফুলের অলঙ্কারে উহাকে সাজাইয়া দেয়। সুশীলবাবু ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া একটু চিন্তা করিলেন, পরে মৃদুস্বরে বলিলেন,—"এ অমিয়া?" অমিয়াকে বলিলেন "অমিয়া আমার কাছে এস ত মা! এ শোকদুঃখময় নরকতুল্য সংসারের তুমি সত্যই দেববালা। তোমার শান্তিপূর্ণ মুখখানি দেখিয়া আমার মনে আজ কি ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না।"

অমিয়া সাগ্রহে মাতুলের ক্রোড়ে গেল। সে ভাবিল তাহার মামা বুঝি রাগ করিয়াছেন, ফুল পাইলে তাঁহার রাগ যাইবে। এই ভাবিয়া সাগ্রহে ও সানন্দে আধ আধ বোলে বলিল,—"মামা, ফুল নেবে? আমাল হাতে কত বল ফুল দেখ।" এই বলিয়া তাহার হাতের পদ্মফুলটী মামার নাসিকার নিকট লইয়া গেল।

সুশীলকুমার ফুলটী নিজ হস্তে লইয়া আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার মুখের ভাব সহজ হইয়া উঠিল। অতুলবাবু এই সহসা পরিবর্ত্তন দেখিয়া কতরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, নূতন এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রাকৃতিক অথবা কারুকার্য্যপ্রসূত সৌন্দর্য্য পীড়িত মনের যেমন অতি উপাদেয় ঔষধ, এবং পথ্য, সুমিষ্ট ও তানলয় বিশুদ্ধ যন্ত্র বা কণ্ঠসঙ্গীতে যেমন উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল করিয়া দেয়, তেমনি অতি সুন্দর ও মধুর সৌরভেও বুঝি মানুষের তাপিত প্রাণকে শীতল করে। প্রলুপ্ত জ্ঞানকে প্রবুদ্ধ করিবার পক্ষে

কোন ইন্দ্রিয়ই কর্ম্ম কার্য্যকারী নহে। এমন দেখা গিয়াছে যে, অতি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বা নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগে যে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতে পারা যায় নাই, প্রিয়তম ব্যক্তির করস্পর্শেই সে মূর্চ্ছা তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া গিয়াছে।

অতুলবাবু বুঝিলেন, ভগবানের দয়াতে সকলই হইতে পারে। অমিয়া ও পদ্মফুল উপলক্ষ করিয়া আজি সেই দয়াময়ই সুশীলকুমারের সংজ্ঞা পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া দিলেন। তিনি আনন্দিতচিত্তে ভক্তি গদ-গদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবন্! তোমার জয় হউক, অমিয়া তুই চিরজীবী হইয়া এইরূপে সকলের তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া দিস্।"

(ক্রমশঃ)

বাঁউনি।

হিন্দুর বৎসরে ত্রয়োদশটী প্রধান পার্ব্বণ। এতদ্ভিন্ন প্রায়ই একটা না একটা বার ব্রত পালা পার্ব্বণের ব্যবস্থা আছে। এত উৎসব পার্ব্বণ আর কোন প্রদেশের কোন জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। হিন্দুর এত অধিক পূজা পার্ব্বণ দেখিয়া অনেকে নিন্দা ও পরিহাস করেন, কিন্তু বোধ হয় ইহাতে নিন্দা বা পরিহাসের কোন কারণ নাই। ত্রিকালজ্ঞ পূজ্যপাদ ঋষিগণ যে হিন্দুর প্রতিকার্য্যে উৎসব পার্ব্বণগুলি নিয়মবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদয় হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য প্রতিপাল্য—যেহেতু সেগুলি হিন্দুর ধর্ম্মগত সংস্কার, জাতিগত সংস্কার ও পুরুষপরম্পরানুগত সংস্কার; পরন্তু ঋষি-দিগের প্রবর্ত্তিত বিধিগুলি যে নিগূঢ় অর্থ-মূলক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গৃহী যাহাতে সংসার-ধর্ম্মে নিরত থাকিয়া আত্মদর্শন করতঃ মুক্তিমার্গে আরূঢ় হইতে পারেন, তন্নিমিত্ত তাঁহারা এত পূজা পার্ব্বণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত ক্রিয়া-কাণ্ডই ধর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধ, সকলগুলিতেই দান, ধ্যান, ভজন, সাধন, সংযম, কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে। আমাদিগের মন সংসার-কুহকে নিয়ত বিচলিত, এই চঞ্চল মনকে ব্রহ্মচিন্তায় সংলগ্ন করিবার নিমিত্ত এত বার ব্রত পূজা পার্ব্বণের ব্যবস্থা প্রচলিত। সেই একই হিরণ্যগর্ভাখ্য পুরুষ গৃহীর সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের চরম লক্ষ্য।

ত্রয়োদশটি প্রধান পার্ব্বণের মধ্যে বাঁউনিও ধর্ম্মানুমোদিত অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য পার্ব্বণ। অতি প্রাচীনকাল হইতে ধারাবাহিক অনুসারে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে মকরসংক্রান্তির পূর্ব্ব বাসরে বাঁউনিবাধা পার্ব্বণবিধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। উক্ত দিবস সন্ধ্যাকালে দীপ জ্বালিবার পরক্ষণেই প্রতি দ্বারে গঙ্গাজল ও ঘরে ঘরে ধূপ, ধূনা, গুগ্‌গুল দিয়া কুলস্ত্রী-দিগকে পট্টবস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক শৌচাচারে শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে নবীন সুবর্ণ-

ধান্যশীর্ষ আম্রপত্রে সংযোজন করতঃ "বাহার কোটি হয়ে মা লক্ষ্মী অবতীর্ণা হও" বলিয়া বাক্স, পেঁটরা, সিন্দুক ইত্যাদিতে বাঁউনি বাঁধিয়া দিতে হয়। তিন দিবস উক্ত দ্রব্যাদি খুলিয়া অর্থাদি বাহির করিতে নাই। বাঁউনিবন্ধনান্তে সন্তানদিগের মঙ্গলার্থে অবশিষ্ট বাঁউনিগুলি তাঁহাদিগের শিরো-দেশে স্পর্শ করাইয়া লক্ষ্মীদেবীর অচলা স্থিতি-কামনায় তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিতে হয়। বাঁউনি বাঁধা হইলে তিন দিবস শুদ্ধাচারে পিষ্টক তৈয়ার করিয়া, সরা খুরি শুদ্ধ লক্ষ্মীদেবীর নিবেদনার্থে পরিষ্কার স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা আছে। দিবসত্রয়ান্তে সেই পিষ্টকসমেত সরা খুরী, জলাশয়ে নিক্ষেপ করিতে হয়, এবং সেই দিবসত্রয় কুলাঙ্গনাগণ পিষ্টক, পুলি, পায়স প্রস্তুত করিয়া সানন্দে স্বামী, পুত্র, দাস, দাসী, আত্মীয়, প্রতিবেশীকে আহার করাইয়া আপনারা ভক্ষণ করিবেন, ইহাই বিধেয়। অধুনা বাঁউনিবাঁধা পার্ব্বণ অনেকে কুসংস্কার জ্ঞানে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন; যাঁহারা এখনও ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা কেবল সংক্ষেপে কার্য্য সমাধা করেন মাত্র। এখন বাঁউনিবাঁধাক্রিয়া যেন নিতান্ত দায়গ্রস্ত কর্ম্মসারা ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আর তেমন আগ্রহ আড়ম্বর, উদ্যোগ, উৎসব নাই। কিন্তু বড় বহুদিনের কথা বলিতেছি না আমা-দিগের প্রপিতামহী ও বৃদ্ধ প্রপিতামহীগণ যে আমোদ, আহ্লাদ, উৎসাহ, উদ্যম হৃদয়ে লইয়া, "পাটীশাপটা," 'সরুচাকলি,' 'আস্কে,' "রাঙ্গা আলু, গোলআলু, চিপী-টক' প্রভৃতির সুস্বাদু সুমিষ্ট পিষ্টক প্রস্তুত করিতেন, তৎপরিবর্ত্তে আমরা এখন পাশ্চাত্যের অনুচিকীর্ষায় কেক্, বিস্কুট, পনির, চকোলেট্ প্রভৃতি খাইতে শিখিয়া পিষ্টক পুলির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। প্রত্যুত মনের আগ্রহহীনতা বশতঃ সেরূপ উপাদেয় পিষ্টক পুলি প্রস্তুত করিতেও পারি না, সুতরাং তেমন উপা-দেয়ও হয় না।

হিন্দুর ক্রিয়াকলাপ, উৎসব, পার্ব্বণ, সকলই ধর্ম্ম-ভিত্তির উপর স্থাপিত। হিন্দু-ধর্ম্মের সকল বিষয়ই দ্বিভাবযুক্ত—একটি বাহ্যিক, অপরটি আধ্যাত্মিক। সাধারণের নিমিত্ত বাহ্যিক, জ্ঞানীদিগের জন্য আধ্যা-ত্মিক। বাঁউনির বাহ্যিক অর্থ সকলেই অবগত আছেন; আধ্যাত্মিকভাবে বুঝা যায়,—ইহাও পরমার্থলাভের একটি উৎকৃষ্ট উপায়। আধ্যাত্মিক অর্থ উদ্ঘাটন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ধান্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা উচিত। হিন্দু যে যে দ্রব্য দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হন, সেইগুলিকেই বিগ্রহ বলিয়া পূজা করেন, ধান্যও সেই শ্রেণীভুক্ত। বাঁউনি ধান্যেরই অন্যতম পার্ব্বণ। যে যে সময়ে কৃষক ক্ষেত্র হইতে ধান্য কর্ত্তন করিয়া গোলা পূর্ণ করে, সেই সেই সময়ে ইক্ষুপূজা, লক্ষ্মীপূজা, নবান্ন, বাঁউনি প্রভৃতি বিভিন্ন নাম করণ করিয়া, হিন্দু এক একটা পার্ব্বণ উৎসব করিয়া থাকেন। হিন্দুর নিকট ধান্যই মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী! কেননা যে বৎসর ধান্য সুলভ হয়,

সে বৎসর অন্যান্য সকল দ্রব্যই সুলভ হইতে দেখা যায়। তজ্জন্য শাস্ত্রকারগণ ধান্যের লক্ষ্মী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আহারীয়ের মধ্যে অন্নই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক আহার। অবশ্য ফল, মূল, ক্ষীর, সর, ননী, ছানা ইত্যাদি সুমিষ্ট, সুস্বাদু, সুরসাল সাত্ত্বিক ভোজ্য বস্তু বিস্তর আছে বটে, কিন্তু ভারতের—বিশেষতঃ বঙ্গের অধিবাসিবৃন্দের অন্নাহার ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সে সকল ভক্ষণ করিয়া দিনাতিপাত হয় না, কেননা দুই একদিন অন্নাহার ব্যতীত অন্য নানাবিধ রসনার তৃপ্তিকর আহার-সামগ্রী ভক্ষণ করিলেও শরীরে যেন কেমন অবসাদ আসিয়া পড়ে ও রুক্ষ ভাব বোধ হয়। সেই জন্য "ভাজা বল ভুজি বল ভাতের সমান নয়" প্রবচনটি বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অন্ন শরীরধারণার্থ প্রধান খাদ্য। ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ স্বয়ং বলিয়াছেন, "অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি" অর্থাৎ অন্ন হইতে প্রাণী সকল উদ্ভূত হয়, সেই হেতুই হিন্দু অন্নের এ প্রকার পূজা পার্ব্বণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বোধ হয় গৃহস্থের শয়নে স্বপনে ঘর ও গৃহস্থালী সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ রাখিবার নিমিত্তই সাত্ত্বিক নিদর্শন স্বরূপ ধান্য শীর্ষবন্ধন করিয়া দেওয়া হয়। তিন দিন 'পিঠে ভাত' খাওয়ার অর্থ—সাত্ত্বিক অন্নের পিষ্টক তিন দিন অর্থাৎ জীবনের ত্রিকাল। (শৈশব—সত্ত্ব, যৌবন—রজঃ, জরা—তমঃ) আহার করিয়া চিত্ত যাহাতে সত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ থাকে তাহারই বিধি ব্যবস্থা। বাউনি বাঁধার তিন দিবস বাক্স পেঁটরা সিন্দুকাদি হইতে অর্থাদি বাহির করিয়া ব্যয় করা নিষিদ্ধ। ইহার তাৎপর্য্য এই, জীবনের ত্রিকালে—শৈশবে যৌবনে বার্দ্ধক্যে—সাত্ত্বিক ভাব অপব্যয় করিতে নাই, অপব্যয় না করিয়া প্রত্যেক মনুষ্য যদি সাত্ত্বিক ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ থাকেন, তবে সেই নিত্য, মুক্ত, সারাৎসার, পরাৎপর ভূমানন্দের সাহচর্য্য-লাভ অনায়াসসাধ্য, সেই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বাউনি বাঁধার সুগম পথ গৃহমেধীকে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

জীবনচক্র।

(১৩১৩ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।)

আমরা গতবারে বিশ্বচক্রের সহিত জীবনচক্রের প্রসঙ্গ করিয়াছি। কিন্তু উহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দিতে পারি নাই এবং যে চক্রের প্রতিকৃতি দিয়াছিলাম, তাহারও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারি নাই। এই অভাব পরিপূরণের নিমিত্ত বর্ত্তমান প্রবন্ধে কয়েকটা কথা বলা যাইতেছে।
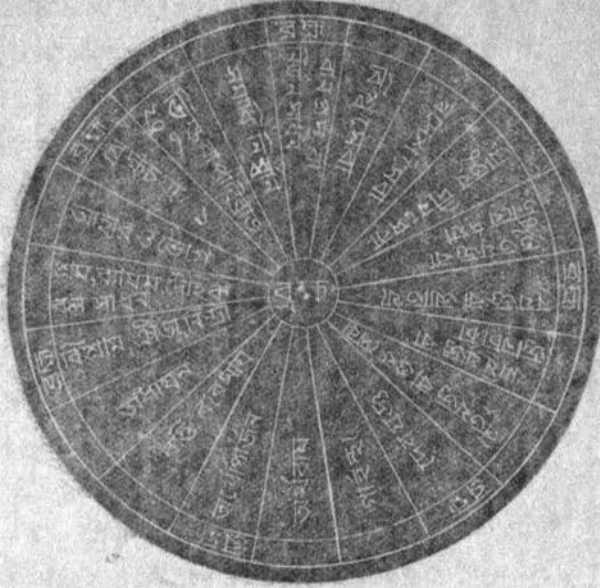
প্রাচীন আর্য্যগণ জীবনকে চারি আশ্রমে বিভক্ত করেন—(১) ব্রহ্মচর্য্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ, (৪) ভিক্ষু। চারি আশ্রমই ধর্ম্ম লইয়া, এবং ধর্ম্মোপার্জ্জনই ইহাদের চরম উদ্দেশ্য। প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া জীবনের ভিত্তি সংগঠিত করিতে হয়। ইহার জন্য আহার. শ্রম ও বিশ্রাম আবশ্যক, কিন্তু সকলই পরিমিত ও সংযতভাবে করিতে হইবে। এইজন্য নিষেধ ও বিধির প্রয়োজন। এই সঙ্গে ধর্ম্মগ্রন্থঅধ্যয়ন, নানাপ্রকার বৃত্তি ব্যবসায় শিক্ষা এবং ন্যায়পথে অর্থোপার্জ্জনও হইতে পারে। আমাদের চিত্রে ব্রহ্মচর্য্যের সহিত আটটা ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের সময় যদি প্রথম ২৫ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়, এই সময়ের মধ্যে এই কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইতে পারে এবং এইরূপ প্রারম্ভিক কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশের সম্পূর্ণ যোগ্য হয়। যাঁহারা আমরণ ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিতে চান, এই সকল কার্য্যেই তাঁহারা জীবন অবসান করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগের জীবনের মূলে ও অন্তে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান আবশ্যক। গার্হস্থ্য জীবনের সহিত ৯টা ঘর আছে, প্রাচীনকালে বিশ্বাসী হিন্দুর পক্ষে পঞ্চযজ্ঞ দৈনিক কর্ত্তব্য বলিয়া অবশ্য অনুষ্ঠেয় ছিল। দেবযজ্ঞের দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা, পিতৃযজ্ঞ দ্বারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পণ, ঋষিযজ্ঞ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা, নৃযজ্ঞদ্বারা অতিথি-অভ্যাগত-সেবা এবং ভূতযজ্ঞদ্বারা জীবের প্রতি দয়া প্রকাশিত হইত।

বর্ত্তমান সময়ে এ সকলও পালনীয়, কিন্তু গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে স্বদেশের হিতসাধন এবং বিশ্বসেবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

প্রাচীন হিন্দুরা "বনং পঞ্চাশতো ব্রজেৎ" বলিয়াছেন। সাধারণতঃ ২৫ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত গৃহধর্ম্ম সাধন অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজনকে পালন করিয়া সংসারের কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লওয়া উচিত। তখন বনে প্রস্থান বা নির্জ্জনে বাস করিয়া ব্রহ্মের সহিত আত্মার যোগসাধন কর্ত্তব্য। এই সাধনের পরিণাম ব্রহ্মে সমাধি অর্থাৎ আপনার কামনা বাসনা সমুদয় পরিবর্জন করিয়া ঈশ্বরেতেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ২৫ বৎসর কাল এই মহাসাধনার ব্যয় করা কিছু অধিক নহে।

জীবনের শেষ অবস্থা ভিক্ষুর অবস্থা। এ অবস্থায় মানব সমাধিস্থ যোগী হইয়া সর্ব্বত্র অবস্থান করিতে, সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিতে এবং যথা ইচ্ছা ভ্রমণেরও যোগ্য হইবেন। মানুষ ঈশ্বরে তদ্‌গত হইয়া যদি জীবনের অবশিষ্ট কাল তাঁহারি প্রেরণায় জীবন যাপন করিতে পারেন, তাঁহার মনুষ্যজন্মধারণ সার্থক হয়। তিনি ঈশ্বরে ক্রীড়া করেন, ঈশ্বরে রমণ করেন এবং তাঁহারি ভাবে পূর্ণ হইয়া জীবনের সকল কার্য্য সমাধান করেন। এইরূপ ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত। পরিপক্ক ফল যেমন বোঁটা হইতে খসিয়া পৃথিবীর ক্রোড়ে পতিত হয়, তিনিও সেইরূপ দেহ হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের ক্রোড়ে স্থান লাভ করেন।

৺ নলিনীবালা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

প্রভো!

মার গলে পরাইয়া বিজয়-মালিকা।
রয়েছ কোলেতে তুলি তারি ছবি আঁকা।
মরমের অন্তঃস্থল—মূরতি অতুল।
সদাই দেখায় মোরে বৈতরণীকূল॥
নয়ন-সম্মুখে নাচে মরণের ছায়া।
না দেয় ধাইতে উর্দ্ধে অসার এ মায়া॥
কৃতান্তের ছায়া-শূন্য যেই দিব্যধাম।
বিচূর্ণ পরাণ তথা লভুক বিরাম॥
বিরহ কোথায় প্রভো! উর্দ্ধে মম স্থান।
তবে কেন কাঁদে সদা অবোধ পরাণ?

সেবাময়ী আদর্শ ব্রহ্মকন্যা নলিনীবালার জলবিম্বের মত ক্ষণস্থায়ী জীবন শুধু স্বার্থ-বিবর্জ্জিত বিশ্বসেবায় উৎসর্গ হইয়াছিল। আমাদের গৃহ, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়স্বজনের নিকট চিরকাল অবারিত দ্বার ছিল। প্রিয়তমা নলিনীর সৌরভপূর্ণ জীবন আজীবন অপরের সুখসচ্ছন্দতার বিধান-ব্যবস্থায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে যিনি তাহার দৈনন্দিন জীবন লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি অকুণ্ঠিত হৃদয়ে তাহাকে স্বর্গের দেবী আখ্যা দিতে প্রস্তুত হইবেন।

এক এক সময় আমাদের ভবনে অসংখ্য লোকের সমাগম হইত। অনেকেই কিছু-মাত্র সংবাদ না দিয়া সুদীর্ঘকালের জন্য সন্তানাদি বৃহৎ পরিবারসহ আমাদের গৃহে অবস্থান করিতেন। আমার চিরকালই ভগ্ন স্বাস্থ্য। একা এত বৃহৎ সংসারের সকল দিক্ সুচারুরূপে রক্ষা করা অসম্ভব বোধ হইত।

প্রাণের কন্যা নলিনী শৈশব হইতে পড়া শুনায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্য্য দক্ষতা প্রদর্শন পূর্ব্বক এ বিষয়ে আমার সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিত।

অনেক সময়ই প্রিয়তমা নলিনীবালা অতিথিগণকে নিজের শয্যা ও উপাধান বিতরণ করিয়া দুরন্ত শীতকালীন রাত্রিতে মেজের উপর মাদুরে বালিশবিহীন ভাবে কাটাইত। বিনম্র বালিকার এইরূপ আত্মত্যাগের ঘটনা সময় সময় আমি অনেক কৌশলে টের পাইয়া বিস্তর ক্ষোভ প্রকাশ করিতাম, কিন্তু জ্যোৎস্নারূপিনী সেবাময়ী কন্যা হাসিমুখে এইমাত্র উত্তর দিত যে, "আমি ত বেশ ঘুমাইয়াছি।" সাধারণতঃ নলিনীবালাকে দেখিলে তাহাকে অতীব মৃদু ও ভীরু প্রকৃতির মেয়ে বলিয়া ধারণা জন্মিত। কিন্তু কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহার কোমল প্রকৃতিকে অত্যাশ্চর্য্য দৃঢ় ও তেজঃপূর্ণ করিয়াছিল। অনেক দুরন্ত ছেলে মেয়ের ভার দূরস্থিত বন্ধুগণ আমাদের স্কন্ধে অর্পণ করিতেন, এজন্য সময় সময় আমায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। বসু মহাশয় সর্ব্বদাই মোকর্দ্দমা উপলক্ষে দূরদেশে অবস্থান করিতেন, নিজের সন্তানদের দেখা-শুনার অবকাশও তাঁহার অল্পই ঘটিত। ঐ সকল দুরন্ত ছেলেদের সহবাসে আমার সন্তানগণও শাসনের বহির্ভূত হইবে, এই আশঙ্কায় বিশেষ সাবধান হইয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। নলিনীবালা ছেলেদের শাসনের ও সুশিক্ষার আশ্চর্য্য প্রণালী জানিত। তাহার নিকট দোষ করিয়া লুকান অত্যন্ত কঠিন ছিল। বেয়াদবী কি অশিষ্ট ব্যবহার তাহার অসহ্য ছিল। কোন ছেলের অশিষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য করিবামাত্র নলিনীবালা তাহার সংশোধনে প্রাণ দিয়া লাগিত, যতক্ষণ কৃতকার্য্য না হইত, অসীম দৃঢ়তা সহ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। পিতামাতার ভয়ে কদাপি কর্ত্তব্য কার্য্যে বিরত থাকিত না। একদিকে যেমন দৃঢ় ছিল, অপর দিকে কুসুম-কোমলা প্রকৃতি তাহাকে বড়ই মনোহর ভাবে গঠিত করিয়াছিল। ছেলেরা প্রাণান্তে "নলিনী দিদির" কোন আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিতে সাহস করিত না। সভাসমিতিতে নলিনী-বালা শৈশবাবধি পিতার সহিত যাতায়াত করিয়া সমাজে চলা ফেরার রীতি নীতিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। আমাদের গৃহে ইংলণ্ডের পদস্থ লোকেরা সময় সময় আতিথ্যগ্রহণ করিতেন। সকলেই একবাক্যে নলিনীর শিক্ষা ও সভ্য ব্যবহারের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। রেভারেণ্ড ফ্লেচার উইলিয়াম, রেবারেণ্ড হার উড, সুবিখ্যাত মদ্যপান-নিবারণী সভার প্রচারক স্মেডলী প্রভৃতি মহোদয়গণ নলিনীবালাকে অত্যন্ত সম্মান

করিতেন। বিখ্যাত রমাবাইর অভ্যর্থনা জন্য আমাদের ১৮ নং মট্‌স্‌লেনে এক বিপুল সভা আহূত হইয়াছিল। ৪ বৎসরের বালিকা নলিনী তাঁহাকে কুসুম-স্তবক দানে সর্ব্বাগ্রে অভ্যর্থনা করেন। বিদুষী রমাবাই নলিনীর নির্ভীক, বাল্যসুলভ-চঞ্চলতা-বিহীন, গম্ভীর স্বভাব লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হন এবং তাহাকে কোলে লইয়া অতি মনোহর একটী সংস্কৃত কবিতা মুখে মুখে রচনা করেন। তাহার অর্থ এইরূপ ছিল—শুভ্র পদ্মকোরক নলিনী পবিত্রতা ও সৌরভপূর্ণ কলিকা। নারায়ণ তাহার এই শুভ্রতা ও সৌরভপূর্ণ মনের পূর্ণবিকাশ করিবেন।

নূতন সংবাদ।

১। ভারতের প্রাচীন সেনাপতি লর্ড কিচ্‌নার আগামী সেপ্টেম্বর মাসে পদত্যাগ করিয়া জাপান ঘুরিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তাঁহার স্থানে জেনারেল স্যার ওমুর ক্রীগ প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইবেন।

২। শ্রীযুক্ত এস, পি, সিংহ মহোদয়ের ব্যবস্থাসচিবের পদে নিয়োগ উপলক্ষে তাঁহার সম্মানার্থ গত ১৭ই এপ্রেল নয়বার তোপধ্বনি করা হইয়াছিল।

৩। লাহোরে ইসলামিয়া কলেজে বড় লাট লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের পরিদর্শন উপলক্ষ্যে তাঁহার সম্মান রক্ষার্থ আঞ্জুমান ইসলাম "মিণ্টো মঞ্জিল" নামে ৪০০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটী ব্যায়ামশালা ও পুস্তকালয় স্থাপিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

৪। গবর্ণমেণ্ট পাঁচ টাকা মূল্যের ইউনিভারসাল নোট প্রচার করিয়া সকলের অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে পঞ্চাশ টাকার নোট যাহাতে সকল স্থানে অবাধে চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন।

৫। নির্ব্বাসিত দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মাশয়ের পুত্র ও বাবু শ্যাম সুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভ্রাতা তাঁহাদের সহিত কারাগারে সাক্ষাতের অনুমতি পাইয়াছেন।

৬। কলিকাতার গঙ্গার উপরিস্থিত সেতুতে লোক ও শকটাদি চলাচলের অত্যন্ত অসুবিধা হয় বলিয়া পোর্ট কমিশনার সেতু বিস্তৃতির সঙ্কল্প করিয়াছেন।

৭। সম্প্রতি জার্ম্মণ রাজ্যে যুদ্ধার্থ নূতন প্রকারের ব্যোমযান প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহা আকাশমার্গে বায়ুর প্রতিকূলে ও অনুকূলে যে দিকে ইচ্ছা অনায়াসে চালিত করা যাইতে পারিবে। ইংলণ্ডেও ঐরূপ ব্যোমযান প্রস্তুতের চেষ্টা হইতেছে।

৮। বোম্বায়ের জুনাগড় প্রদেশে রসুল খাঁজী তুলায় কল নামে একটী কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে।

৯। পারস্যের প্রজাবৃন্দের অসন্তোষের কারণ এখনও দূর হয় নাই। তাহারা সদলবলে লুটপাট করিতেছে। ইংরাজ ও রুষ প্রতিনিধিগণ পারস্যের সাহকে নগররক্ষার সুব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

১০। বিলাতের পার্লামেণ্ট মহাসভার শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের সভ্যদিগের মধ্যে মতানৈক্য হওয়ায় তাঁহাদের অন্যতম সভ্য মিঃ কেয়ার হার্ডি প্রমুখ কয়েকজন শ্রমজীবী নেতা সভ্যের পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

১১। কাবুলের আমীর মহোদয় প্রচার করিয়াছেন, যে, তাঁহার সৈন্যদিগের মধ্যে অশ্বারোহী, পদাতিক প্রত্যেক বিভাগেই এক এক দলে এক এক জন মোল্লা নিয়োগ করিতে হইবে। তাঁহারা সৈন্যদিগকে ধর্ম্মোপদেশ ও রাজভক্তি এবং বাধ্যতা শিক্ষা দিবেন।

১২। সুনীতি কলেজের পারিতোষিক বিতরণ—বিগত ১৫ই বৈশাখ বুধবার কুচবেহার সুনীতি কলেজের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে তত্রস্থ ল্যান্সডাউন হলে মহারাজা কুচবেহারাধিপতির সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় অনেক কৃতবিদ্য মহাত্মা এবং মহারাণী কুচবেহারেশ্বরী সি, আই প্রভৃতি অনেক উন্নতমনা বিদুষী রমণী উপস্থিত ছিলেন। মহারাণীর অভিপ্রায়ানুসারে কুচবেহার কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল শীল এম্, এ, সুনীতিকলেজের বাৎসরিক বিবরন পাঠ করেন। বাগ্মিবর ব্রজেন্দ্র বাবু বিদ্যালয়ের সমগ্র উন্নতির বিষয় ইংরাজিতে উল্লেখ করেন এবং বালিকাদিগের চরিত্র গঠন ও সুশিক্ষা প্রদান জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিসেস্ সুপ্রীতি মজুমদার ও অন্যান্য শিক্ষায়িত্রীদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। কুচবেহারাধিপতি মহারাজা বাহাদুর ইংরাজিতে এক নীতিগর্ভ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। কিরূপ প্রণালীতে শিক্ষা দান করিলে বালিকাগণ ভবিষ্যতে সুপত্নী, সুমাতা ও লক্ষ্মীরূপা গৃহিণী হইতে পারেন, মহারাজা বাহাদুর নিজ সারগর্ভ বক্তৃতায় তাহা বিশদরূপে দর্শাইয়াছেন। মহারাজা ও মহারাণীর প্রতি বালিকাদিগের ভক্তি-উপহার এবং সভাস্থলে পঠিত কবিতা ও সঙ্গীতনিচয়ের কিয়দংশ বামাবোধিনীর বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। এবং স্থানাভাবে অবশিষ্টগুলি পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য রাখা হইল।

১৩। ২৩শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে আলিপুরের জজ শ্রীযুক্ত বীচ্ক্রফ্ট বোমার মামলার রায় দিয়াছেন :—

১। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, ২। শ্রীদেবব্রত বসু, ৩। শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন, ৪। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বক্সী, ৫। শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন, ৬। শ্রীবিজয়কুমার নাগ, ৭। শ্রীবিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৮। শ্রীকুঞ্জলাল শাহী, ৯। শ্রীদীনদয়াল বসু, ১০। শ্রীনিখিলেশ্বর রায়, ১১। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দেব, ১২। শ্রীহেমচন্দ্র সেন, ১৩। শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৪। শ্রীধরণীধর গুপ্ত, ১৫। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৬। শ্রীবীরেন্দ্র

নাথ ঘোষ, ১৭। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ফাঁসি।

১। শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও ২। শ্রীউল্লাসকর দত্তের ফাঁসি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ হইয়াছে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

১। শ্রীইন্দুভূষণ সেন, ২। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ, ৪। শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার, ৫। শ্রীহেমচন্দ্র দাস, ৬। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৭। শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন, ৮। শ্রীহৃষীকেশ কাঞ্জিলাল ৯। শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সেন ও ১০। শ্রীইন্দ্রনাথ নন্দীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ হইয়াছে।

দশ বৎসর দ্বীপান্তর।

১। শ্রীপরেশচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীনিরাপদ রায়ের দশ বৎসর দ্বীপান্তর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ হইয়াছে।

সাত বৎসর দ্বীপান্তর।

১। শ্রীঅশোকচন্দ্র নন্দী, ২। শ্রীবালকৃষ্ণ হরি কাঁনে ও শিশিরকুমার সেনের সাত বৎসর দ্বীপান্তর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণজীবন সান্যালের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ হইয়াছে।

শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র দেব বোমার মামলায় মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজদ্রোহের অপরাধে পুনরায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

১৪। এই বৎসর নিম্নলিখিত বালিকাগুলি ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে।

(১) শ্রীমতী হর্ষবালা বিশ্বাস (২ বিভাগ) (বেথুন কলেজ)

(২) শ্রীমতী নির্ম্মলা বালা নায়েক (২ বিভাগ প্রাইভেট)

(৩) শ্রীমতী মানদা সরকার (১ বিভাগ প্রাইভেট)

(৪) শ্রীমতী মৃণালিনী বসু (১ বিভাগ প্রাইভেট)

গৃহচিকিৎসা পাচন ও মুষ্টিযোগ।

১। বহুমূত্রে—তেলাকুচ পাতার রস ২ তোলা ॥০ আনা পরিমাণ মধুসহ প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে মূত্রাধিক্য ও প্রবল তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

২। মূত্রে চিনি জন্মিলে জামের বিচী চূর্ণ ।০ আনা পরিমাণ মধুসহ সেবন করিলে মূত্রের চিনি কমিয়া যায়।

৩। অপস্মার অর্থাৎ হিষ্টিরিয়া রোগে প্রত্যহ মধুর সহিত যথা সম্ভব ৵০ ৶০ ।০ আনা পরিমাণ বচ চূর্ণ সেবন এবং দুগ্ধান্ন

পথ্য করিলে বহুদিনের হিষ্টিরিয়া রোগ নষ্ট হয়।

৪। মূর্চ্ছারোগে প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় ধারোষ্ণ দুগ্ধ অর্থাৎ দোহনকালীন দুগ্ধ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৫। মাথায় উকুন হইলে নালিতার বিচী অর্থাৎ পাটবীজ কাঁজি সহ বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে সমস্ত উকুন মরিয়া যায়।

বামারচনা।

বঙ্গ-বন্দনা।

১

বঙ্গ-জননি লো!
জীবন দায়িনি, সুধা-প্রসবিনি,
স্বর্গ-রূপিণি লো!

২

বঙ্গ-জননি লো!
নমামি পাবনি, ফল প্রদায়িনি,
শোক-নাশিনি লো!

৩

কুসুমকুন্তলা, সুনীল অঞ্চলা,
শস্য শ্যামলা লো!

৪

বঙ্গ জননি লো!
অমরবন্দিতা, মহিমমণ্ডিতা,
হর্ষ-বর্ষিণি লো!

৫

বঙ্গ জননি লো!
চন্দন চর্চ্চিতা, বেদ-মুখরিতা
চিত্রকারিণি লো!

৬

বঙ্গ-জননি লো!
শিরসে তারকা, উরসে মাণিকা
ওলো স্বর্গ-রূপিণি লো!

৭

বঙ্গ জননি লো!
জ্যোৎস্না-প্রফুল্লিতা, পদ্মেপুলকিতা,
দেব-নন্দিনি লো!

৮

বঙ্গ-জননি লো!
রত্নবিমণ্ডিতা, বিশ্বপ্রশংসিতা,
স্বর্গ-রূপিণি লো!

শ্রীমতী অম্বুজা দাসগুপ্তা।

ডাক্‌রে পাখি!

(সুনীতি কলেজের ১৯০৯ সালের পুরস্কার বিতরণোপলক্ষে)

ডাক্‌রে আবার পাখি! ডাক্‌রে আবার,
বসন্তের পাখী তুমি রবে কি নীরব?
ডাক পাখি! ডাক তুমি ডাক বার বার,
ডাক আজ শুনি মোরা তোমার সুরব।

(২)

চাইনাক আর পাখি! কিছুই তোমার,
চাই শুধু তাঁর নাম শুনিতে কেবল,
গাও পাখি! সেই নাম গাও অনিবার।
গাও শত মুখে তাই গাও অবিরল।

(৩)

অই নামে অই ধ্যানে ঋষি-ভক্তগণ
ঈশা, মুষা, ব্রহ্মানন্দ সবে মাতোয়ারা,
গাও পাখি! গাও তাই গাও অনুক্ষণ
আমরাও তব স্বরে হই আত্মহারা।

(৪)

গাওনা স্বাধীন প্রাণে গাও একবার,
গাওনা স্বাধীন স্বরে "হোক্ তাঁর জয়"
গাওনা তাঁহার নাম গাও বার বার,
গাও তাঁর যশ পাখি! গাও বিশ্বময়।

(৫)

গাও শুভদিনে আজ প্রমুক্ত আকাশে
গাওনা তরুর শাখে সান্ধ্য সমীরণে,
গাওনা স্বাধীন পাখি! স্বাধীন উচ্ছ্বাসে
মহিমা তাঁহার গাও মধুর কূজনে।

(৬)

গাও পাখি! গাও আজ গাও গাও বিশ্বযুড়ি,
গাও আমাদের কত শুভদিন আজ,
"সাগরদীঘির"বক্ষে মুক্ত পক্ষে উড়ি
গাও ধন্য "মহারাণী" ধন্য "মহারাজ"।

অশ্রুজল।

১

অয়ি অশ্রু! তুমি কিগো সঙ্গিনী আমার?
হৃদয়-সাহারা-ভূমে
ক্ষণিকের তরে নেমে
ঢাল গো স্নেহের ধারা শান্তির আধার।

২

অয়ি অশ্রু! তুমি কিগো প্রেমের মোহানা?
ইন্ধন জ্বলিয়া যায়
তুমি বারি ঢাল তায়?
ধুয়ে লও হৃদয়ের গভীর যাতনা।

৩

বিশাল সংসারমাঝে আমি অণুকণা
তোমারে হইলে হারা
দুর্ব্বিষহ সংসার-কারা
তা'হলে মুহূর্ত্ত তরে আর বাঁচিব না।

৪

এ হৃদয়-মরুভূমে তুমি শান্তিজল
এসো অশ্রু! নেমে এসো
মধুর মোহন বেশে
তুমিই ত শান্তিসেতু অভাগী সম্বল।

৫

জীবনের সাথী তুমি ওগো অশ্রুজল!
মরমে অনল জ্বলে
শান্তি পাই তোর জলে,
অনন্ত জীবন ভরে কাঁদিব কেবল।

শ্রীপ্রিয়বালা রায়।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, হাওয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 550. June, 1909.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।"

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৫০ সংখ্যা। { জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। জুন, ১৯০৯। } ৯ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জাতিভেদ—সে দিন ভারতের সকল জাতি বা সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী মানব কলিকাতায় একত্র সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ভারতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন এবং পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া স্থূলগ্রাহী লোক ভারতের লোকগুলাকে হেয় জ্ঞানে উড়াইয়া দিতে চাহে। এবং কেহ কেহ এমনও ভাবেন যে, ভারতের অখ্রীষ্টান জাতির ধর্ম্মজ্ঞান নাই। তাহারা কেহ কেহ স্পষ্টই বলিয়া থাকেন যে, অখ্রীষ্টান জাতি সত্যের মর্য্যাদা জানে না। পাপ পুণ্য কিরূপে বুঝিবে? এ সকল তর্ক সম্প্রতি দূরে রাখিয়া অদ্য কেবল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্মপাল মহাশয়ের সে দিনকার বক্তৃতার সারাংশ প্রথমে পাঠকগণের কর্ণগোচর করিতেছি।

ধর্ম্মপাল বলিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্মের মূল বুঝিতে হইলে প্রথমে পালিজাতকা গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। ইহাতে এইরূপ বর্ণন আছে। বহুকল্প পূর্ব্বে কোন ধনবান্ ব্রাহ্মণের গৃহে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহার নাম সমেধা ছিল। সমেধা যৌবনকালে উত্তরাধিকারী সূত্রে ধনকুবের পিতার সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই জগতে বারম্বার জন্মগ্রহণ করিয়া জীবনব্রত পালনে বিস্তর যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। এ দুঃখের কি অবসান নাই? ব্রাহ্মণসন্তান জাতীয় নিয়মানুসারে বেদপুরাণ আদি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে যুক্তি স্থির করিলেন, নির্ব্বাণ ভিন্ন নিষ্কৃতি নাই। নির্ব্বাণ পদ পাইবার জন্য হিন্দুর গ্রন্থে সমস্ত প্রকার উপদেশ আছে। বাসনাত্যাগই হিন্দুর সার কার্য্য।

সমেধা সর্ব্বস্ব দান করিয়া নিস্পৃহভাবে বৈরাগ্য অবলম্বনে হিমালয়গিরিগুহানিকটে কোন এক স্থানে আশ্রম করিয়া আত্মতত্ত্ব চিন্তা বা তপস্যা করিতেছিলেন। বাসনা-

ত্যাগী হিন্দু যোগীদের তপস্যাই এইরূপ অদ্যাপি শুনিতে পাই। হিমগিরির এক একটি গহ্বরে বা কুটীরে যে সকল সাধু পুরুষ বসিয়া আছেন, তাঁহারা ফুল;বিল্বদল দিয়া দেব দেবীর পূজা বা নৈবেদ্য উৎসর্গ আদি কোন কাজই করেন না। সূর্য্যোদয়ের দুই দণ্ড পূর্ব্বে সে দেশের সেই মহানদীতে নদীতে স্নান করিয়া কুটীরে প্রবেশ করেন, আর বাহির হন না। আহারের জন্য লালায়িত নহেন। তবে এ সকল দেশের হিন্দু রাজগণ কৌলিক-প্রথা অনুসারে প্রত্যহ সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে রুটি, পুরী হইতে পর্য্যাপ্ত ক্ষীর দুগ্ধ পাঠাইয়া দেন। নূতন ব্রতীরা রুটি আদি ভোজন করেন। চরমপন্থিগণ সামান্য দুগ্ধপান করিয়া জীবনরক্ষা করেন। তপস্বীরা মুদিত নয়নে সারাদিন পরমব্রহ্ম চিন্তা করেন মাত্র। বৌদ্ধ তপস্বীরাও অহিংসা পরমধর্ম্ম বলেন। তাঁহারাও বাসনাহীন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

জয়পুরের পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী। জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী রাও বাহাদুর সংসারচন্দ্র সেন সি, আই, ই; এম, ভি, ও, গত ১১ই মে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। সংসারচন্দ্র প্রায় ৪৩ বৎসর কাল জয়পুরে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইউরোপীয় ও ভারতবাসী সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি একখনি জায়গীর পাইয়াছিলেন। বিগত জানুয়ারী মাসে একখানি অভিনন্দন প্রদান উপলক্ষে ভূতপূর্ব্ব রেসিডেন্ট কর্ণেল বলিয়াছিলেন যে, তিনি কখনও কাহারও নিকট হইতে তাঁহার প্রশংসা ভিন্ন আর কিছু শুনিতে পান নাই। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন যে, তাঁহার ন্যায় বিনয়ী, ন্যায়নিষ্ঠ, উদারচেতা ব্যক্তি বিরল।

বুড়ী কার্পাসের চাষ।—বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের বহুদর্শী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে বুড়ী কার্পাসের চাষ বিশেষ লাভজনক হইবে। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বুড়ী কার্পাস উত্তমরূপে জন্মিবে। ভালরূপ জন্মিলে এক বিঘায় এক মণ কার্পাস সূত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক মণ বুড়ী কার্পাসের মূল্য অন্যূন ৩০্ টাকা। এক বিঘার খরচ প্রায় ১০্ টাকা। সুতরাং এক বিঘা হইতে ২০ টাকা লাভ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা কম নহে। বর্ত্তমান সময়ে ধানে কিম্বা পাটে এত লাভ পাওয়া যায় না। তবে ধান কিম্বা পাট নিম্ন ভূমিতে জন্মে, কিন্তু কার্পাস চাষের জন্য উচ্চ ভূমির প্রয়োজন। বর্ষাকালে কার্পাসের ক্ষেত্রে জল উঠিলে কিম্বা তথায় জল দাঁড়াইলে গাছ মরিয়া যায়। সাধারণ দেশী কার্পাসের মূল্য প্রতি মণে ১২ হইতে ১৪্ টাকা। বুড়ী কার্পাস ইতিপূর্ব্বে সিংভূম জেলায় অল্প পরিমাণে জন্মিত। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ এই কার্পাসের চাষ প্রবর্ত্তন করিতে বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

স্বর্গীয়া শান্তিময়ী।—আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে গত

হয় যে, গিরিধিতে "গৃহলক্ষ্মী" সম্পাদিকা শ্রীমতী শান্তিময়ী সেন পরলোক গমন করিয়াছেন। শান্তিময়ী প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা ও নেশানাল চেম্বার্স অব কমার্স্রের সহকারী সম্পাদক বাবু বিশ্বেশ্বর সেনের পত্নী ছিলেন। শান্তিময়ীকে যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারাই তাঁহার মধুর স্বভাব ও ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইতেন। পিতার প্রতিষ্ঠিত "বালা সমাজ" শান্তিময়ীর জীবনের এক কার্য্যক্ষেত্র ছিল। মাতৃভাষার সেবাতেও শান্তিময়ীর প্রভূত শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত।

তাঁহার কবিতাগুলির ভিতরে যেরূপ ভাবের বিশুদ্ধতা, ভাষার লালিত্য ও ছন্দের মাধুর্য্য লক্ষিত হইত, তাহাতে আশা করা যাইত, স্বাস্থ্য ও সময় পাইলে কালে ইনি বঙ্গসাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন। স্বর্গীয়া সহোদরা বনলতার প্রবর্ত্তিত মহিলাগণ পরিচালিত "অন্তঃপুর" লোপ পাইলে পর শান্তিময়ী "গৃহলক্ষ্মী" নামে এক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন। "গৃহলক্ষ্মী"ও কেবলমাত্র মহিলাদের দ্বারা লিখিত ও পরিচালিত হইত। শান্তিময়ী মৃত্যুকালে স্থির চিত্তে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া, জ্ঞাত:বা অজ্ঞাত অপরাধের জন্য সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া রোগক্লিষ্ট দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ২৩ বর্ষ বয়সে বঙ্গমাতার ক্রোড় হইতে একটী শোভা ও সুরভি মণ্ডিত জীবনপুষ্প ঝরিয়া পড়িল!

বিলাত যাত্রা।—বিলাতের ইম্পিরিয়ল্ সম্পাদক মণ্ডলীর অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্য "বেঙ্গলী" পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস্" পত্রের সম্পাদক মিঃ ডিগ্‌বী আহূত হইয়াছেন। গত ২৫শে বৈশাখ শনিবার ভারত-সভাভবনে উভয়কে বিদায় সম্বর্দ্ধনার জন্য এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। উহাতে এখানকার বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভারতবাসী উপস্থিত ছিলেন। ভারতসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, উভয়কে সম্বর্দ্ধনাসূচক কতিপয় কথা বলিলে পর, উত্তরপাড়ার কুমার রাজেন্দ্রচন্দ্র এবং মেহেটে সাহেব উভয়কে পুষ্পগুচ্ছ উপহার দেন ও মাল্য দ্বারা বিভূষিত করেন। বিগত ২৯শে বৈশাখ ইহাঁরা দুইজনে বোম্বাই মেলে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। আমরা ইহাঁদের এই শুভ যাত্রার মঙ্গল কামনা করি।

নির্ব্বাসিতদিগের সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে আবেদন।—পার্লমেণ্টের একশত ছয় চল্লিশ জন সভ্য বঙ্গদেশের নির্ব্বাসিতদিগের পক্ষ হইতে যে আবেদন করিয়াছিলেন; প্রধান মন্ত্রী মিঃ আস্কুইথ তাহার উত্তরে বলিয়াছেন—ভারতবর্ষকে গভীর আন্দোলনের হস্ত হইতে রক্ষা করার জন্যই এই নয়জন ব্যক্তিকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। কতদিন তাহাদিগকে নির্ব্বাসনে রাখা হইবে এবং কখন তাহাদিগকে মুক্তি দান করা হইবে কেবল ভারতগবর্ণমেণ্ট ও

লর্ড মর্লী ইহার বিচার করিবার অধিকারী। ভারতবর্ষে যখন প্রতিনিধিমূলক শাসন-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে, তখন কোনরূপ অরাজকতা প্রশ্রয় না পায় এবং দমনের জন্য যে সমস্ত আইনসঙ্গত বিধান আছে তৎসমুদয় কোন প্রকারে খর্ব্ব করা না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক।

তুরস্কে নবীন যুগ।—তুরস্কের নবীন সুলতান পঞ্চম মহম্মদ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই প্রজামণ্ডলীর মঙ্গলের হিতার্থে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রতাপশালী ভ্রাতা আবদুল হামিদ আত্মশক্তির সীমা লঙ্ঘন করিয়া, সন্তানসদৃশ প্রজার প্রবর্দ্ধমান আকাঙ্ক্ষার দমন করিতে যাইয়া আজ কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেন, তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। সম্মানে ও প্রতাপে আবদুল হামিদের তুল নরনাথ আর কেহ ছিল না। তিনি সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান জাতির খালিফা বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। সমগ্র মুসলমান সমাজ, তাঁহারই নামে মস্তক অবনত করিত। বহু রাজার রাজ্যে তাঁহারই মঙ্গলকামনায় ভগবানের নিকট 'খোৎবা' পঠিত হইত। কিন্তু মোহবশে তিনি আপনার গণ্ডীর পরিধি বুঝিতে পারেন নাই; তাই ছলে, বলে, কৌশলে তিনি বর্দ্ধমান প্রজাশক্তির গতিরোধ করিতে গিয়াছিলেন। তাই আজ অসীম সম্মানভাজন হইয়াও তিনি তরঙ্গপ্রহত শিথিলমূল বনস্পতির ন্যায় অকস্মাৎ ধরাশায়ী হইলেন। ১৮৭৬-৭৭ অব্দে তিনি প্রজাকে কোরাণ-সম্মত অধিকার দান করিয়াছিলেন; কিন্তু পর বৎসরই প্রজার সেই পবিত্র অধিকার কাড়িয়া লইলেন। ১৮৭৮ অব্দ হইতে আবদুল হামিদ তুরস্কের নব্যতন্ত্রদিগকে উৎপীড়িত ও নির্ব্বাসিত করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে সেই প্রজাশক্তি দমিত না হইয়া বরং দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ১৯০৫ অব্দে স্যালোনিকা সহর নব্যতন্ত্রীদিগের একটী মিলনস্থান নির্ব্বাচিত হয়। এই স্থানেই ইউনিয়ন ও প্রগ্রেস-কমিটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জনসাধারণ এই কমিটীর মতেই মত দিল। মোল্লা, মাতওয়ালী, উলেমা ও মৌলবীগণ কমিটীর পক্ষ সমর্থন করিলেন। সুলতান আবদুল হামিদ বুঝিলেন, আর এই বিশাল প্রজাশক্তির মূলচ্ছেদ করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনি কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে, প্রাণপণে তিনি প্রজাশক্তির পালন করিবেন। গত জুলাই মাসে তুরস্কে প্রজাসভার প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু চঞ্চলচিত্ত আবদুল হামিদ সে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই জন্যই তাঁহার এ দশা ঘটিল; সেই জন্যই সিরাজ উল্-ইস্লাম তাঁহার উপর কোরাণের পবিত্র লিপি অসম্মানিত করার অভিযোগ আরোপিত করিলেন,—সেই জন্যই তিনি সমগ্র মুসলমান সমাজের খালিফা হইয়াও ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান প্রজা কর্ত্তৃক প্রণষ্টগৌরব হইলেন। হায় সুলতান!

পঞ্চম মহম্মদ অবিমৃষ্যকারিতার এই

দারুণ পরিণাম দেখিয়াছেন। কারাগারে কঠোর যন্ত্রণাতেও তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন, প্রজাশক্তির পালনেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। প্রজাশক্তির অক্ষয় কবচই তাঁহার রক্ষক। তাই তিনি একটীমাত্র শরীররক্ষী লইয়া রাজপথে বাহির হইতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। তিনি বুঝিয়াছেন, স্বার্থত্যাগ না করিলে পরার্থপালন সম্ভবে না,—স্বার্থপরায়ণ হইলে প্রজাহিতৈষণা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক কল্পনায় পরিণত হয়। সেই জন্য তিনি স্বেচ্ছায় রাজসংসারের বরাদ্দ মাসহারার পঞ্চমাংশ ত্যাগ করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রজার উৎপীড়ন রহিত করিবার জন্য তিনি অশান্তির দমনকল্পে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সেনা প্রেরণ করিতেছেন—স্বচক্ষে প্রজার অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য স্বয়ং নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আজ মক্কা ও মেদিনায় তাঁহার নামে সংকল্প করিয়া "খোৎবা" পড়া হইতেছে,—খালিফা বলিয়া সমগ্র মুসলমান সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা সংস্থাপিত হইয়াছে। অচিরে তিনি ব্রুসা সহরে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান ও রুমেলিয়া প্রদেশে সুলেমিয়ার কবর দর্শন করিতে যাইবেন বলিয়াছেন।

হালমী পাশাই এইবার প্রধান উজীরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। তিনি ইতিমধ্যেই নূতন করিয়া মন্ত্রিসমাজ গঠিত করিয়াছেন। মোল্লা সাহেবই সেখ উল্ ইস্লাম পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। নব্য-তুর্কদিগের সাধনার ফলে, প্রজাশক্তির অভ্যুদয়ে তুরস্কে নানাজাতির অপূর্ব্ব সমবায় ঘটিতেছে। এখন তথায় তুর্ক, ইহুদী, খুর্দ, আর্ম্মেনিয়ান, গ্রীক, আল্‌বেনিয়ান ও সার্ব্ব জাতি একই বিরাট্-পুরুষের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ রূপে বিরাজ করিতেছে। তুরস্কের এই শুভ্র রক্তরাগ-শূন্য অভ্যুদয় দর্শনে সমগ্র ধরাবাসী ধন্য ধন্য করিতেছে।

আবদুল হামিদ নিজের জন্য অর্থসঞ্চয়ে বিলক্ষণ যত্নশীল ছিলেন। ইলদিজ কিয়স্কে তাঁহার সম্পত্তি তালিকা করিবার জন্য একটী কমিশন নিযুক্ত হয়। কমিশন স্থির করিয়াছেন,—আবদুল হামিদের সাড়ে চারি লক্ষ পাউণ্ডের (৬৭৷৷৹ লক্ষ টাকা) ব্যাঙ্ক নোট, প্রচুর হীরা, মণি, মুক্তা প্রভৃতি জহরৎ ও ৭৫ হাজার পাউণ্ড (১১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার) গোলাপপাশ আছে। এতদ্ভিন্ন বৈদেশিক ব্যাঙ্কে তাঁহার দেড় কোটি টাকা জমা আছে।

মহাভারতের কথা।

উঞ্ছবৃত্তি পরিবারের দানধর্ম্ম।

অত্যাশ্চর্য্য আতিথেয়তা।

পুরাকালে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্ম-পরায়ণ তপস্বিগণ বাস করিতেন। তথায় উঞ্ছবৃত্তি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যা, একটী পুত্র ও পুত্রবধূ ছিল। সেই ব্রাহ্মণপরিবার সংযতাত্মা, ধর্ম্মশীল, সত্য-নিষ্ঠ ও আতিথেয়। তাঁহারা প্রতিদিন পরম ভক্তিযোগে নিয়মিত ধর্ম্মকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতেন, এবং উঞ্ছবৃত্তি (১) দ্বারা যে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য সংগ্রহ করিতেন, তদ্দ্বারা সকলে প্রাণ ধারণ করিতেন।

একদা ঘোর অনাবৃষ্টিবশতঃ দেশের শাক, শস্য, কন্দ-মূল-ফলাদি নিঃশেষ হইল। বহু আয়াসেও আর খাদ্য মিলে না। ঐ ব্রাহ্মণপরিবার উপর্য্যুপরি অনাহারে থাকিয়াও, ব্রত-হোম-পূজাদি নিত্যকর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলেন না। অনশনে ক্রমে তাঁহারা কঙ্কালসার হইলেন। এই-রূপে কয়েক দিন অতীত হইল। একদা তাঁহারা নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া ও বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া, অতি কষ্টে এক প্রস্থ যব (১) সংগ্রহ করিলেন। তাঁহারা পরমযত্নে সেই যবগুলি ভাঙ্গিয়া শক্তু প্রস্তুত করিলেন। তদ্দ্বারা যথাবিধি বলি-কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া, সকলে তাহা বিভাগ করিয়া লইলেন। সে মুমূর্ষু অবস্থায়, সেই এক এক মুষ্টি শক্তু তাঁহা-দের প্রাণপ্রদ অমৃত বলিয়া জ্ঞান হইল। তাঁহারা তাহা ভোজন করিতে বসিতেছেন, এমন সময় এক অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতিথিদর্শনমাত্র তাঁহারা সসম্ভ্রমে আহার রাখিয়া, তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। অতিথিকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন প্রভৃতি দানে ও কুশলপ্রশ্নে আপ্যায়িত করিয়া, ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—মহাশয়! আজি আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে, আপনি কৃপা করিয়া এস্থানে পদার্পণ করিয়াছেন। আপনাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখি-তেছি। এই শক্তু আমাদের বিশুদ্ধভাবে উপার্জ্জিত। এই ধর্ম্মলব্ধ যৎসামান্য ভক্ষ্য আমি শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে (২) আপনাকে

(১) কৃষকেরা ক্ষেত্র হইতে ধান্য-গোধূমাদি কাটিয়া লইয়া গেলে, তথায় ইতস্ততঃ গর্ত্তাদিমধ্যে যে সকল শস্য পতিত থাকে, যাহা পশুপক্ষীরাও লইতে পারে না, তাহা খুঁটিয়া সংগ্রহ করাকে 'উঞ্ছবৃত্তি' বা 'উঞ্ছজীবিকা' বলে। যে ব্যক্তি এইরূপে জীবন ধারণ করে, তাহাকেও উঞ্ছবৃত্তি বলা যায়। ধর্ম্মশীল তাপসগণের কাহারও জীবিকার ব্যাঘাত করিতে নাই।

(১) 'প্রস্থ'—চারি কুড়ব।

(২) অবজ্ঞায় বা অশ্রদ্ধায় দান করিতে নাই। তাহা করিলে, বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ দাতা নিজেই বিনষ্ট হয়।

দিতেছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহা ভোজন করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। অতিথি তাহা সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক ভোজন করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ক্ষুধা শান্তি হইল না। ব্রাহ্মণ তাহা বুঝিতে পারিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন,—এক্ষণে কি উপায়ে ইহাঁর তুষ্টিসাধন করি। অতিথি অতৃপ্ত হইলে, আমার সকল সাধনাই নিষ্ফল হইবে। প্রাণ দিয়াও অতিথিকে তৃপ্ত করিতে হইবে। পতিকে বিষণ্ণ ও চিন্তাযুক্ত দেখিয়া, তাঁহার ভার্য্যা কহিলেন,—নাথ! আমার এই শক্তুভাগ লইয়া অতিথিকে প্রদান করুন। ইনি তৃপ্ত হইয়া গমন করুন। সর্ব্বাগ্রে অতিথির তৃপ্তিসাধন করা আমাদের সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য। সেই অনশন মুমূর্ষু সাধ্বীর ঐ কথা শুনিয়া, ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করিলেন না। অনশন যন্ত্রণা কিরূপ, তাহা তিনি নিজেই অনুভব করিতেছিলেন। সে অবস্থায়, সেই ক্ষুধার্ত্তা, শ্রান্তা, অস্থিচর্ম্মাবশেষা, অনশন-যাতনায় কম্পমানা, বৃদ্ধা, পতিপ্রাণা পত্নীর মুখের গ্রাস তিনি কোন্ প্রাণে হরণ করেন? তিনি বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি ও কথা আর মুখেও আনিও না। দেখ! পশু পক্ষি-কীট-পতঙ্গেরাও প্রাণপণ যত্নে তাহাদের স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করে। তির্য্যগ্‌যোনিরও স্ত্রীজাতি মানবের অবধ্যা (১)। আমি জ্ঞানী মনুষ্য হইয়া, আমার চক্ষের উপর পতিপ্রাণা ধর্ম্মপত্নীর অনশনমৃত্যু দর্শন করিব? প্রিয়ে! তুমি আমার জীবনের মূলবন্ধন, তোমার কল্যাণেই আমার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ; তোমার সহায়তা না পাইলে, সাধ্য কি, আমি ক্ষণমাত্রও বাঁচিতে পারি। মানবের ধর্ম্ম, অর্থ কাম, মোক্ষ, এ চতুর্ব্বর্গেরই সহায় ভার্য্যা। শুশ্রূষা, বংশস্থিতি, আত্মার ও পিতৃলোকের তৃপ্তি-সাধন প্রভৃতি ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত কার্য্যই ভার্য্যার উপর নির্ভর করে। রোগে শোকে দহ্যমান মানবের একমাত্র আশ্রয় ও আরামস্থল তাহার ভার্য্যা। আতপ-তাপিতের পক্ষে যেমন স্নিগ্ধ বটচ্ছায়া, তৃষ্ণার্ত্তের পক্ষে যেমন সুশীতল পানীয়, রোগার্ত্তের পক্ষে যেমন মহৌষধ, মুমূর্ষুর পক্ষে যেমন সঞ্জীবনী সুধা, দুঃখদগ্ধ মানবের পক্ষে তেমনি প্রিয়ংবদা, হিতৈষিণী ভার্য্যা। যে ব্যক্তি ভার্য্যারক্ষণে অক্ষম হয়, তাহার ইহলোকে ঘোর অকীর্ত্তি ও পরলোকে দুস্তর নরক। ফলতঃ তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর কেহ নাই। অতএব তুমি এমন কথা আর মুখে আনিও না।

ব্রাহ্মণী কহিলেন,—নাথ! এ দাসীর প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন, আমার শক্তু লইয়া অতিথিকে তৃপ্ত করুন। পতিসেবায় দেহ ও আত্মার সমাধানই নারীর রতি ও প্রীতি, ধর্ম্ম ও স্বর্গ, ভক্তি ও মুক্তি। আপনি পালনকর্ত্তা, এজন্য আমার পতি। সর্ব্ব-শোকহারী পুত্রমুখ আপনার প্রসাদে দর্শন করিয়াছি, এজন্য আপনি আমার বরদাতা।

"অবজ্ঞয়া ন দাতব্যং কস্যচিল্লীলয়াপি বা।
অবজ্ঞয়া কৃতং হন্যাদ্ দাতারং নাত্র সংশয়ঃ॥"
(রামায়ণ, বালকাণ্ড, ১৩শ সর্গ ৩৩ শ্লোক।)

(১) "অবধ্যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ প্রাহুস্তির্য্যগ্‌যোনিগতামপি।"
(ইতি স্মৃতিঃ)

বিশেষতঃ উপবাসে ও পরিশ্রমে আপনি মরণাপন্ন। পতির এ অবস্থা সম্মুখে দেখিয়া আমি নিজমুখে অন্নজল দিব? এ কথা মনে আনিলেও আমার মহাপাপ। পত্নীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অগত্যা তাঁহার শক্তু লইয়া অতিথিকে দিলেন। কিন্তু তাহাতেও, অতিথির ক্ষুধাশান্তি হইল না। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অতৃপ্ত দেখিয়া, পুনরায় বিষণ্ণ বদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন পুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—পিতঃ! চিন্তা করিবেন না। আমার শক্তু গ্রহণ করিয়া অতিথিকে দান করুন। ইহা আমার পরম ধর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য জানিয়াই একথা বলিতেছি। আপনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে আমার প্রতিপাল্য। বৃদ্ধ পিতামাতার পরিপালন পুত্রের সর্ব্বোত্তম ব্রত এবং তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে আমার কাঙ্ক্ষণীয়। যে পুত্র এ সর্ব্বলোকসম্মত, সনাতন ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হয়, তাহার নরকেও স্থান নাই। ভগবন্! আপনার লোকপাবন, পুণ্যময় জীবন অনর্ঘ্য। এ জীবন রক্ষার জন্য, মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জ্জন করা অতি তুচ্ছ কথা। অতএব আর ইহাতে দ্বিধা করিবেন না। আমি ইহা পুলকিত চিত্তে দান করিতেছি।

পিতা কহিলেন,—পুত্রমুখ দর্শন করিয়া পিতা পুন্নাম নরক (১) হইতে ত্রাণ পায়। পুত্রই পিতা-মাতার কৃতি, কীর্ত্তি ও কুলস্থিতির রক্ষার নিদান। পুত্র শত বৎসরের বৃদ্ধ হইলেও, সে তাহার পিতা-মাতার নিকট শিশু। তুমি ত অল্পবয়স্ক। এ বয়সে তোমাদের ক্ষুধাই বলবতী। আমার এ বৃদ্ধবয়সে ক্ষুধার যাতনা বোধ হয় না। আমি সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছি। এক্ষণে মরণে আমার দুঃখ নাই। হে বৎস! তুমি আমার দেহের ও হৃদয়ের সার-সর্ব্বস্ব, তুমিই আমার আত্মা। প্রাণধন! তুমি চিরজীবী হও। যে পিতা পুত্রকে ধার্ম্মিক ও নিরাময় দেখিয়া মরিতে পারে, তাহার ন্যায় ভাগ্যবান্ কে আছে? আমি ঈশ্বরের চরণে ইহাই প্রার্থনা করি।

পুত্র, স্নেহময় পিতৃদেবের সেই কথা শুনিয়া কাতরভাবে পিতৃচরণে প্রণত হইয়া, গদ্‌গদবচনে কহিতে লাগিলেন,—পিতঃ! যে পুত্র পিতার অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্মকার্য্যে সর্ব্বপ্রযত্নে সহায়তা না করে, পিতার মঙ্গলের জন্য যে পুত্র অম্লানমুখে প্রাণ দিতে না পারে, তাহার জন্মধারণে কি ফল? সে পুত্র থাকা অপেক্ষা নারীর বন্ধ্যা হওয়া ভাল। পিতৃকার্য্যই পুত্রের প্রাণ, পিতৃসেবাই পুত্রের পুত্রত্ব। পিতাই পুত্রের ধর্ম্ম, পিতাই স্বর্গ, পিতাই পুত্রের পরম তপস্যা। সমস্ত দেবপূজার ও ধর্ম্মফল, পিতৃমাতৃভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়। কুল ও ধর্ম্ম হইতে পিতার পতনকে নিবারণ করে বলিয়া, পুত্রের নাম 'অপত্য।' আমি এ সঙ্কটে যদি আপনাকে রক্ষা না করি, তবে পিতঃ! আমার জন্মগ্রহণে ধিক্!

(ক্রমশঃ)

(১) "পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্রইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥"

প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীজাতির অবস্থা।

যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হইয়া, প্রচলিত দেশাচার এবং সংস্কারের বশবর্ত্তী হন, ঐ সকলকেই হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের বিশ্বাস স্ত্রীশিক্ষা এবং নারীজাতিকে সম্মান করিবার প্রথা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিগণ পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে আমাদের সমাজে প্রচলিত করিতে চাহেন। অধুনা স্ত্রীজাতির যতটুকু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, তজ্জন্য নারীসমাজ ব্রাহ্মদের নিকটেই বিশেষ ভাবে ঋণী, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা যে এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে আদর্শ করিয়াছেন, ইহা সত্য নহে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যেমন স্বতন্ত্র নহে, হিন্দুধর্ম্মের সারভাগ লইয়া উহা গঠিত, সেইরূপ নারীজাতিকে সম্মান করিতে হইবে, এই নীতিটী পবিত্র হিন্দুশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। পাশ্চাত্যজাতীয়দের ধর্ম্মে ইহার বিরোধী ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টধর্ম্মে নারীজাতির মান হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় এত উচ্চ নহে। নারীকে (Mothers of all mischiefs) সমস্ত দোষের আকর মনে করিয়া তাহা হইতে দূরে থাকাই তাহার উপদেশ। দয়া ধর্ম্মের অবতার মহাত্মা বুদ্ধও নারীকে সকল প্রকার প্রলোভনের হেতু মনে করিয়া, নারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। পুংশক্তি এবং নারীশক্তিকে যে ধর্ম্মে সমভাবে দেখিতে দেয় না, তাহা কদাচ উদার এবং সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ নহে, প্রকৃতি এবং পুরুষ লইয়াই হিন্দুর ঈশ্বর, তাই ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তিকে আমরা দেবীরূপে পূজা করি। "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" ইহা হিন্দুশাস্ত্রেরই উপদেশ। স্ত্রীজাতিকে এইরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিবার উপদেশ বোধ হয় আর কোন ধর্ম্মেই নাই। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ কর্ত্তব্যবোধে তাঁহাদের শাস্ত্রের অনুশাসন উপেক্ষা করিয়াও স্ত্রীজাতিকে সম্মান করিতেছেন, আর হিন্দুগণ নারীশক্তিকে পদানত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়া শাস্ত্রের উপদেশ লঙ্ঘন করিতেছেন। রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীজাতির কুৎসাপূর্ণ প্রহসন রচনা করিয়া অভিনয় করা আজকাল একটী ফ্যাসান হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল প্রহসনরচয়িতারা সমাজের মঙ্গলেচ্ছু বলিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইতেছেন! স্ত্রীজাতিকে বন্ধে রাখিবার যিনি যত পক্ষপাতী, তিনি তত নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর আসন পাইতেছেন! তাঁহারা মনেও করেন না যে, শাস্ত্রের অনুশাসন না মানিয়া চলা যদি পাপ হয়, তবে প্রকৃতিরূপিণী নারীকে যাঁহারা সম্মানের চক্ষে দেখেন না, তাঁহারাই প্রত্যবায়ভাগী হইতেছেন, এবং যে সকল ব্রাহ্মকে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করিতেছেন। জীবগণের গর্ভধারিণী বলিয়া নারী জননী-স্বরূপা, সুতরাং তাঁহাদিগকে লইয়া

রহস্য করা কখনই বিজ্ঞজনোচিত কার্য্য নহে।

স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন অর্থাৎ জ্ঞানলাভের অধিকার হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত না করিয়া, এবং যথোচিত স্বাধীনতা প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়া ব্রাহ্মগণ সমাজবিপ্লবকারী বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকেন কিন্তু ইহাঁরাই যে প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছেন, এবং হিন্দুধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তিগণই বিজাতীয়ের অনুকরণপূর্ব্বক শাস্ত্রের উপদেশ লঙ্ঘন করিতেছেন, তাহা বুঝাইবার জন্য, আমরা প্রাচীনকালের নারীজাতির অবস্থাসম্বন্ধে অতিসংক্ষেপে আলোচনা করিব। প্রাচীনকালের নারীগণ জ্ঞানালঙ্কারে কিরূপ অলঙ্কৃতা ছিলেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদুক্ত যাজ্ঞবল্ক্য এবং মৈত্রেয়ী সংবাদ পাঠে তাহা বিশেষরূপে বোধগম্য হইবে। আদর্শসতী ভগবতীর প্রতি মহাদেবের ব্যবহার আদর্শ দাম্পত্যজীবনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। প্রাচীনকালের গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সহিত বিচারপ্রয়াসী উভয়ভারতী প্রভৃতি বিদুষী রমণীগণের ইতিহাস তৎকালীন নারীজাতির উন্নতি বিষয়ে অদ্যাপি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যদি স্ত্রীজাতিকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখা, বা গৃহকর্ম্ম ব্যতীত অন্যবিধ জ্ঞান্ হইতে বঞ্চিত রাখা তৎকালে ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইত, তবে কদাচ এই সকল মহিলা জ্ঞান-গৌরবে গৌরবান্বিতা হইয়া আদর্শ নারীরূপে পরিগণিত হইতে পারিতেন না। প্রাচীনকালের রমণীরা কিরূপ অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানসুধাপানের অধিকারিণী ছিলেন, তাহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। উপনিষদ্ হইতে আমরা কেবল কয়েকটী শ্লোকের ভাবার্থ সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

যাজ্ঞবল্ক্য বানপ্রস্থাবলম্বনের প্রাক্কালে তদীয় বিদুষী পত্নী মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলেতেছেন :—

মৈত্রেয়ি! আমি আমার এই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনগমনোদ্যত হইয়াছি, এ সময়ে তোমার এবং কাত্যায়নীর মধ্যে একটা বন্দোবস্ত করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

মৈত্রেয়ী কহিলেন—"প্রভো! যদি এই পৃথিবী ধনরত্নাদিতে পরিপূর্ণা হইয়া আমার অধিকারগতা হন, তাহা হইলে কি আমি অমর হইতে পারিব?" যাজ্ঞবল্ক্য—"না মৈত্রেয়ি! ধনরত্ন প্রভৃতি দ্বারা পৃথিবীতে যে সুখ সম্ভব, উহা দ্বারা তোমার কেবল তাহাই লাভ হইবে, কিন্তু তদ্দ্বারা তোমার অমর হইবার কোনই আশা নাই।"

মৈত্রেয়ী কহিলেন—"যাহা আমাকে অমর করিতে পারিবে না, তাহা লইয়া আমি, কি করিব? অবিনশ্বর বিষয়সম্বন্ধে আপনি যাহা জানেন, দয়া করিয়া আমাকে তাহাই বলুন।"

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—তুমি আমার প্রিয়া এবং আমার প্রিয় প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব। তৎপরে তিনি উপনিষদে ব্যাখ্যাত স্বামী স্ত্রীতে,

পুত্র-কন্যায়, ধনরত্নাদিতে এবং জগতের সর্ব্বভূতে যে প্রকারে পরমাত্মা অবিনশ্বর ভাবে অবস্থিতি করেন, তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। বিদুষী মৈত্রেয়ীও তাহা সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, সেই সময়ে স্ত্রী কেবল গৃহকার্য্যে স্বামীর সহায়তা করিতেন না, পারমার্থিক বিষয়েও তাঁহারা পরস্পরের সাহায্য করিতেন। প্রাচীনকালে অবরোধ-প্রথা ছিল না, এ সম্বন্ধে বহু প্রমাণের মধ্যে নিম্নলিখিত ঘটনাটী সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

রাজর্ষি জনক যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, তখন কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ হইতে ঋষিগণ সমাগত হইয়াছিলেন। রাজর্ষি জনক এক সহস্র গাভীর প্রত্যেক শৃঙ্গে দশ পদ পরিমিত স্বর্ণ বাঁধিয়া দিয়া সমাগত ঋষিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তিকে ঐ সকল গাভী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। জনকের এই আহ্বানে কোন ব্রাহ্মণই স্বর্ণসহ গাভী লইতে সাহসী হইলেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য অগ্রসর হইয়া তাঁহার শিষ্যকে গাভী লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ইহাতে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ অতিশয় ক্রোধপরায়ণ হইলেন এবং তাঁহাকে প্রশ্নপরম্পরা দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিলেন, কিন্তু বুধশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য সকলের প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। কিন্তু সেই মহাসভায় একটী মনস্বিনী মহিলা উপস্থিত ছিলেন, তিনি সমাগত অন্যান্য পণ্ডিত অপেক্ষা জ্ঞানে কোন অংশেই ন্যূন ছিলেন না। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। অবশ্য যাজ্ঞবল্ক্য তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি অত বড় একটা বিরাট্ সভায় একজন মহিলার উপস্থিতি—শুধু উপস্থিতি নয়, জ্ঞানিজনোচিত ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা তৎকালীন নারীজাতির উন্নত অবস্থার উত্তম পরিচয় প্রদান করে।

বস্তুতঃ নারীজাতির প্রতি সম্মানের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোনও প্রদেশে কিম্বা আর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। রমণীগণ স্বকীয় জ্ঞান-গরীমায় গৌরবান্বিতা হইয়া স্বামীর যথার্থ সহধর্ম্মিণী এবং তাঁহার জীবনপথের প্রকৃত সহচারিণী ছিলেন, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ন্যায় প্রাচীনকালের নারীদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল না বটে, কিন্তু এখনকার ন্যায় কঠোর অবরোধপ্রথা তৎকালে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল। তাঁহাদের স্বাধীনতা ছিল বটে, কিন্তু তাহা শাসন-সংযত ছিল। আজি কালি হিন্দুসমাজে যে অবরোধপ্রথা দৃষ্ট হয়, তাহা মুসলমানদের নিকট হইতে গৃহীত। সাধারণতঃ রাজার অনুকরণ করিতে সকলেই ভালবাসে, সুতরাং মুসলমানরাজত্বকালে কতকটা তাঁহাদের প্রিয়তা বশতঃ এবং অন্যবিধ কারণে যে হিন্দুসমাজে নারীজাতির হীন এবং কারারুদ্ধ ভাবে রাখিবার ব্যবস্থা

হইয়াছে, তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদ স্বয়ং নারীজাতিকে সম্মান করিতেন না, এবং এমন কঠোর অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন যে বয়স্ক পুত্রের জননীর সমক্ষে যাওয়াও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না; সুতরাং মুসলমানরাজত্বকালে যে স্ত্রীজাতির হীনাবস্থা হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলের রমণীদের স্বাধীনতা আমাদের এই উক্তির সমর্থন করে। ঐ সকল প্রদেশে মুসলমান-শাসন তেমন বদ্ধমূল হইতে পারে নাই বলিয়াই তথাকার নারীজাতি প্রাচীন আর্য্যভাব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। মুসলমান-শাসনকালে হিন্দুগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব হারাইয়াছিলেন, কিন্তু এখন শিক্ষার আবশ্যকতা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। এ সময়ে নারীজাতির উন্নতির প্রতি যে সকল মহাত্মার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। ঈশ্বর তাঁহাদের শুভ সঙ্কল্পের সহায় হউন।

শ্রীশতদলকামিনী বিশ্বাস।

দাগীচোর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম, ঠিক্ বলিতে পারি না, তবে জ্ঞান হইলে দেখিলাম, সূর্য্য অস্তমিতপ্রায়, আমি মধুপুর ডাকবাঙ্গালার একটী সুসজ্জিত কক্ষে খাটের উপর শায়িত অবস্থায় রহিয়াছি,—আমার বুকের কাছে আমার অঞ্চলের ধন আমার হারানিধি,—আমার জীবনের সারসর্ব্বস্ব,—খোকা বসিয়া আছে! প্রথমে মনে হইল, আমি বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছি, বুঝি স্বপ্নের কুহকেই আনন্দসাগরে ভাসমান হইতেছি, সেজন্য একবার চোকে ও কপালে হাত বুলাইলাম,—একবার নিজের অঙ্গুলি নিজে দংশন করিলাম,—স্পর্শ ও বেদনা অনুভূত হইল। তবু মন স্থির হইল না, খোকাকে কোলে তুলিয়া মুখচুম্বন করিলাম,—সে অশ্রুসিক্ত মুখে হাসিয়া উঠিল এবং "বাবা, তুমি দেখ এসে, মার ঘুম ভেঙ্গেছে," বলিয়া ডাক দিবামাত্র আমার স্বামীও কক্ষান্তর হইতে আগত হইলেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন, "ওগো! তুমি উঠেছ? এমন সুখের দিনে তুমি অজ্ঞান হইয়া পড়াতে আমাদের অর্দ্ধেক আনন্দ যেন নিভিয়া গিয়াছে। ঐ দেখ নীলখিয়া বসিয়া আছে, উহাকে আশীর্ব্বাদ কর এবং তোমার যাহা ইচ্ছা হয় পুরস্কার দাও,—আজ উহারই গুণে আমাদের সোণার খোকাকে আবার সবল ও সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়া পাইয়াছি।"

সংক্ষেপে বলিতেছি,—খোকাকে সেদিন অমন অসুস্থ দেখিয়া যখন আমরা বিব্রত ও চিন্তায় আকুল হইয়া পড়ি, তখনই নীলখিয়া মনে মনে একটী সঙ্কল্প করিয়া-

ছিল, কিন্তু আমরা কেহই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইব না জানিয়া সে চুপ করিয়াছিল,—কাহাকেও কোন কথা বলে নাই। তারপর অনেক রাত্রিতে আমরা ক্লান্ত, শ্রান্ত ও অবসন্ন ভাবে ঘুমাইয়া পড়িলে সে চুপে চুপে একখানা গরম কাপড়ে খোকার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করতঃ তাহাকে কোলে লইয়া দ্রুত গমনে "বিজল পাহাড়ে উহাদের নিজ গ্রামে লইয়া যায় এবং তাহার বৃদ্ধা মাতামহীর ব্যবস্থামত বন্য লতা পাতার রস ও ফল খাওয়াইয়া, এই কয় দিনেই খোকাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়াছে। খোকা উহাদের নিকট প্রথম দুই দিন কিছুতেই থাকিতে চাহে নাই, কেবল কাঁদিয়াছিল, কিন্তু নীলখিয়া তাহাকে অশেষ যত্নে ও নানা প্রকারে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল। টের পাইলে আমরা খোকাকে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার আগেই লইয়া আসিব ভয়ে, আমরা চিন্তিত এবং ব্যস্ত হইব জানিয়াও, সে আমাদিগকে এত দিন কোন সংবাদ প্রেরণ করে নাই। আজ খোকাকে লইয়া সে গিরিডিতে ফিরিয়াছিল। এমন সময় পথে আমাদের সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হইয়াছে।

'সব ভাল যার শেষ ভাল'! এতদিন যে নীলখিয়াকে সকলে রাক্ষসী, পিশাচী সয়তানি বলিয়া গালি দিয়াছিল, আজ সেই নীলখিয়ার আদর যত্ন দেখে কে? আমি ত প্রাণের আবেগে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম এবং পাগলের মত কত কি বলিলাম, তাহা এখন মনে আসিতেছে না! আমার শেষ স্বর্ণাভরণ ইয়ারিং দুইটী নীলখিয়াকে দিতে গেলাম, সে রাগে সরিয়া গেল এবং বলিতে লাগিল যে, সে ধন বা ধন্যবাদের আশায় এ কাজ করে নাই, বড় প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাই এমন দুঃসাহসের কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। খোকার কোন অমঙ্গল ঘটিলে সে তাহার নিজের প্রাণও সেই সঙ্গে বিসর্জ্জন দিত! সাওতালের সরল ভাষায় নীলখিয়া যখন এই কথাগুলি বলিতে লাগিল, তখন কেহই অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারি নাই! ভগবান্ কাহার হৃদয় কি উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছেন, বাহ্য আকার দেখিয়া আমরা ক্ষুদ্র জীব, তার কি বুঝিব?

তার পর খোকার কথা,—তাহার আকৃতি এই কয় দিনেই কেমন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার সেই রুগ্ন অস্থি কঙ্কালসার মূর্ত্তি আর নাই, চোখে মুখে যে পাংশুবর্ণ ছিল, তাহা বিদূরিত হইয়া যেন হাসিরাশি উছলিয়া পড়িতেছে! দেহের জীর্ণ ভাব অপনীত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে যেন স্বাস্থ্যের পূর্ণ জোয়ার খেলিতেছে! এত অল্প দিনে এমন অভাবনীয় পরিবর্ত্তন বিধাতার বিশেষ করুণার ফল বই আর কি বলিব? আমার সকল কষ্ট, সকল মনোবেদনা, সকল পথ-শ্রম, সকল অর্থব্যয় আজ সার্থক মনে হইতে লাগিল! ভগবান্ যে এই হতভাগিনীকে আবার এমন সুখের দিন দেখাইবেন, তাহা স্বপ্নেও আশা করি নাই!

তখনই গিরিডিতে টেলিগ্রাম করা হইল। আমার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া

পড়াতে রাত্রিকালে ডাকবাঙ্গলাতেই অতিবাহিত করিলাম। পরদিন প্রত্যূষে সকলে পুনরায় গিরিডিতে ফিরিলাম। কমলা টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত সংবাদে ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারে নাই, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় সে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে। এখন আমাদের সঙ্গে খোকাকে ফিরিতে দেখিয়া, সে যেন আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িল! চারিদিকের আরও অনেক ভদ্রলোক সপরিবারে আসিয়া খোকাকে দেখিয়া গেলেন এবং আমাদের এই সুখের দিনে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিলেন। নন্দ বাবু সকলকেই মিষ্টান্ন দানে পরিতৃপ্ত করিলেন। নীলখিয়ার প্রশংসায় গিরিডি পূর্ণ হইল।

৮

বেশী কথা আর লিখিব না। দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়াছে—খোকা এখন বড় হইয়া তিনটা পাশ দিয়াছে এবং বিষয় কর্ম্মের চেষ্টায় আছে। আমাদের আর সন্তান হয় নাই,—সে এখনও আমাদের সেই "সাত রাজার ধন এক মাণিক"ই আছে। ঈশ্বর-আশীর্ব্বাদে আমাদের পূর্ব্বদারিদ্র্যও এখন অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে। হরিমতি এখন আর কাজ কর্ম্ম করিতে পারে না, সে বসিয়া শুইয়া কাটায়, তাহার বয়স ৭০ বৎসর অতীত হইয়াছে। নীলখিয়াও এখন আর সাধারণ দাসীর মত গৃহকর্ম্ম করে না, সে এখন কেবল পুঁটী ও খোকাকে আদর যত্ন করিয়াই সময় কাটায়। সে কখনও গিরীডিতে নন্দবাবুর নিকট, কখনও এখানে আমাদের খোকাকে লইয়াই থাকে। শেষে সে আর আমাদিগকে থাকিতে দিল না,—"দুজনকে একত্র" দেখিবার জন্য বড়ই জেদ করিতে লাগিল। হরিমতিও সেই মতে মত দিল। আমরা আর তাহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। নন্দ বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় খোকার সহিত অরুন্ধতীর বিবাহ দিব, স্থির করিয়াছি। এখন প্রজাপতির করুণায় শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়।

একটা দুঃখ আমার এখনও যায় নাই,—বাক্যবাণে আমি এখনও সেইরূপ জলিয়া মরিতেছি। সেদিনও খোকার বিবাহ-প্রসঙ্গে আমাকে কত কথা শুনিতে হইল। "কেমন,—কে দাগীচোর? খোকার বাপ না খোকার মা? কার মহিমায় আজ নন্দগোপালের অমন টুক্‌টুকে মেয়েটী আমাদের ঘরে আসিতেছে? এ বিবাহের ঘটকী কে?—নীলখিয়া?—না শ্রীমতী সু—? সেই গিরিডিতে, রান্না ঘরে বসিয়া বার বছর আগে কমলার কাছে এ প্রস্তাব কে করেছিল?" আমি ত শুনিয়া অবাক্‌,—উঁহার কি এত পুরাতন কথাও মনে থাকে।

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ।

ঈর্ষার বন্দিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজি হইতে অনুবাদিত।

তখন অক্টোবর মাস, শীতের প্রারম্ভ-কাল। দিন অতি সংক্ষিপ্ত। সেদিন সূর্য্য অস্ত গমন করিলে, সন্ধ্যার ঘনীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়া আমাদের ট্রেণ যতই গন্তব্যস্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে লাগিল, ততই আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। আমি আমার কামরায় একাকিনী বসিয়া আমার অব্যবহিত গত জীবনের কাহিনী সভয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। অব্যবহিত অতীত জীবন বলিতেছি—কেননা গত দুই বৎসরের মধ্যে আমি এ জগতে ধনজন ও আশ্রয়-হীন হই। সেই দুঃখশোকময় গত দুই বৎসরই আমার অব্যবহিত অতীত জীবন। সেই দুঃখশোকময় আমার অতীত জীবন মানস চক্ষু-সম্মুখে সে দিন যেরূপ উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, সেরূপ পূর্ব্বে আর কখন হয় নাই। যে ধনশালী পিতা মাতার একমাত্র সন্তান, যাহার সুখময় শৈশবজীবনে দুঃখ কিম্বা কষ্টের সামান্য রেখামাত্র অঙ্কিত হয় নাই, তাহার আজি একি অসহায় অবস্থা! যতই আমার মনে আমার বর্ত্তমান অসহায় অবস্থার কথা উদিত হইতে লাগিল, ততই আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। আশৈশব আমার জীবন নানা দেশ ভ্রমণে অতিবাহিত হইয়াছিল। আমার পিতামাতা ভ্রমণপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। শিশু-কাল হইতে আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা ইউরোপের সকল প্রদেশে বৎসরের অধিকাংশ সময় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। সেজন্য আমার শিক্ষাকার্য্য নিয়মিতরূপে সম্পাদিত হইবার প্রায়ই সুযোগ ঘটিত না বটে, কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা বিষয়ে আমার যথেষ্ট সুবিধা ঘটিয়াছিল। আমি ফ্রান্সে অবস্থিতিকালে ফ্রান্সের বিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষা ও জার্ম্মেণী অব-স্থিতিকালে জার্ম্মেণ ভাষা ও ইটালী অব-স্থিতিকালে ইটালিয়ান ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম। আমার উনিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমার মাতার মৃত্যু হয়। সেই আমার প্রথম শোক। সেই নিদারুণ শোকে আমার হৃদয় অতি ভীষণরূপে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে শোকের তীব্রতা অপনোদিত হইবার পূর্ব্বে আমি ত্বরায় অন্য ঘোরতর শোকের সম্মুখীন হই। আমার মাতার মৃত্যুর পর পিতার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি আমার মাতার মৃত্যুর পর ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার ব্যবসা বাণিজ্যে বিপুল লোকসান ঘটে, এবং তিনি সম্পূর্ণ নিঃসম্বল

হইয়া পড়েন। মাতার শোকে ভগ্নপ্রাণ পিতা এই ঘটনায় একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়েন এবং ত্বরায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। এই সময় আমার বয়ঃক্রম একবিংশতি বৎসর হইয়াছিল। পিতার শোচনীয় মৃত্যুর পর আমি তাঁহার ত্যক্ত কুড়ি পাউণ্ড সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর আমি জগতে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়া পড়ি। জগতে আমাদের বন্ধু ও আত্মীয়ের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। ভ্রমণকালে অনেকের সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু কোন ব্যক্তির সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা সংস্থাপিত হয় নাই,—যাহাকে আমার এই বর্ত্তমান অসহায় অবস্থার কালে প্রকৃত বন্ধু স্বরূপে গণনা করিতে পারি।

আমার মাতা আমার ন্যায় তাঁহার পিতা মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। সেজন্য তাঁহার পিতৃপরিবারে আত্মীয় স্বজন আর কেহই ছিলেন না। আমার পিতৃপরিবারে আমার পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত ছিলেন। কোন উচ্চ রাজকার্য্যে ব্রতী হইয়া তিনি ভারতবর্ষে গমন করেন। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটী সন্তান সন্ততি হইয়াছিল। সমস্ত জগতে তাঁহার সুনাম ও খ্যাতি যথেষ্ট বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সহিত আমার কখন চাক্ষুব দর্শন ঘটে নাই, এবং আমার এই বর্ত্তমান অসহায় অবস্থাকালে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিব এ চিন্তাও আমার মনে একবারও উদিত হয় নাই। আমার পিতা আমার পিতামহের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। প্রথম যৌবনে তাঁহার প্রকৃতি বড়ই উচ্ছৃ-ঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। সেজন্য তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে সুনজরে দর্শন করিতেন না। বিবাহের পর আমার পিতাও অধিক তত্ত্ব লইতেন না। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারা আমাকে সহানুভূতি-সূচক পত্র লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই সকল পত্রে আমার প্রতি তাঁহাদের অনু-রাগের কোন চিহ্ন প্রদর্শিত হয় নাই, এবং আমার জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদের বদান্যতার উপর নির্ভর করিবার বাসনাও আমার মনে কখনও উপস্থিত হয় নাই।

জীবিকানির্ব্বাহের জন্য আমার নিকট একটী মাত্র পথ উদ্ঘাটিত ছিল। আমি তিনটী বিদেশী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলাম। সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় আমার নিপুণতা হইয়াছিল। আমি যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলাম তাহা কোন পরিবারের মধ্যে গৃহশিক্ষয়িত্রীর পদ লাভ করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সেই জন্য আমি কোন পরিবারের মধ্যে গৃহশিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। যদিও অভীষ্ট ফল লাভ করিতে বহু বিলম্ব ঘটিয়াছিল, তথাপি অবশেষে আমি আমার মনোনীত অভীষ্ট কার্য্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। একদিন লণ্ডনের এজেণ্ট আফিস আমাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল যে, লর্ড ড্রাণ্টলী নামক স্কটলণ্ডদেশীয় অভিজাতবংশীয় একজন ধনী লর্ড তাঁহার পীড়িতা ভগিনীর

জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী অন্বেষণ করিতেছেন। তাঁহার ভগিনী মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতা-পীড়ায় পীড়িতা হইয়া শয্যাগতা অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন। লর্ড ডান্‌টলী এরূপ একজন মহিলার অন্বেষণ করিতেছেন, যাঁহাকে শিক্ষয়িত্রী অপেক্ষা তাঁহার ভগিনীর সঙ্গিনীরূপে অবস্থিতি করিতে হইবে; এবং তাঁহার ভগিনীর পীড়াজনিত কষ্টের লাঘব করিবার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহাকে আমোদ প্রমোদ ও কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে। আমি এইরূপ কর্ম্মের সন্ধান পাইবামাত্র অবিলম্বে লর্ড ডান্‌টলীর নিকট তাঁহার ভগিনীর সঙ্গিনীর পদপ্রাপ্তির নিমিত্ত আবেদন করিলাম; এবং কয়েকদিনের মধ্যেই আমি লর্ড ডান্‌টলীর নিকট হইতে কার্য্যে নিয়োগের পত্রও প্রাপ্ত হইলাম। লর্ড ডান্‌টলী স্কটলণ্ডের উত্তরদিকস্থ সমুদ্রকূলে তাঁহার পৈতৃক দুর্গে বাস করিতেন। সেই স্থানেই তাঁহার জমিদারী। আমি স্কটলণ্ডের উত্তরদিকস্থ সেই লর্ড ডান্‌টলীর আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

(ক্রমশঃ)

আলমোড়া ভ্রমণ।

বাল্যকাল হইতেই আমার হিমালয়-ভ্রমণের বড় সাধ ছিল। গিরিরাজের তুষারধবল শৃঙ্গ, শ্যামলবনরাজিশোভিত বন্ধুর বিশাল পর্ব্বতশ্রেণী, মনোরম উপত্যকাভূমি, গিরিনদীর কল তান, প্রভৃতি যখন কল্পনায় অঙ্কিত করিয়া মানস-নেত্রে দেখিতাম, তখনই মনে মনে বিমলানন্দ অনুভব করিতাম। এতদিনের পর আমার কল্পনার সৌন্দর্য্য,—মানসমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারিব ভাবিয়া বড়ই আনন্দ হইল। নানা কারণে আমার পিতৃদেবের শরীর বড় অসুস্থ হইয়াছিল, তাই তিনি স্বাস্থ্যপ্রদ আলমোড়া শৈল ভ্রমণের অভিলাষ করিলেন। আমার পিতৃবন্ধু, এলাহাবাদের ডাক্তার, পিতৃপ্রতিম পরম-ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তখন স্বাস্থ্যলাভের আশায় আলমোড়ায় বাস করিতেছিলেন। তিনি তথায় যাইবার নিমিত্ত বাবাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। দুর্গম পথ বলিয়া বাবা প্রথমে তথায় যাইতে চাহেন নাই, কিন্তু পথে কোন কষ্টের সম্ভাবনা নাই শুনিয়া, এবং কাকাবাবুর পত্রে উৎসাহিত হইয়া শেষে আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। নানাবিধ শোকে দুঃখে আমার মানসিক অবস্থাও তখন বড় শোচনীয় হইয়াছিল। ১৭ই কার্ত্তিক সোমবার বাবা ও তাঁহার সঙ্গে আমি ও আমার বালিকা ভ্রাতুষ্পুত্রী নির্ম্মলা, এই তিন জনে O. R. R. রেলপথে যাত্রা করিলাম। পথে বেরিলী ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিয়া, আবার আমরা

রোহিলখণ্ড কুমায়ুন ট্রেনে উঠিলাম। পর দিন অতি প্রত্যূষে ট্রেন কাঠগুদাম ষ্টেশনে পৌঁছিল। ষ্টেশনের বিশ্রামকক্ষে নামিয়া প্রভাত হইবার অপেক্ষায় আমরা বসিয়া রহিলাম। তখন শীতের প্রারম্ভ, কার্ত্তিক মাসে পশ্চিমাঞ্চলের নিম্নভূমিতেই বেশ শীত বোধ হয়। পার্ব্বত্য প্রদেশে শীত অত্যন্ত প্রবল হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। সে সময় নাইনিতাল ও আলমোড়া প্রভৃতি পাহাড়ের অধিবাসিবর্গ নামিয়া আসিতেছিলেন। কাঠগুদাম হইতে আলমোড়া যাইতে হইলে দাণ্ডি বা ডুলী করিয়া যাইতে হয়, পথে দুই দিন লাগে। কাঠগুদাম হইতে আলমোড়া ৩২ মাইল। এখান হইতে অশ্বযান বা টঙ্গায় আলমোড়া যাইবার পথ এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয় নাই। অন্য সময় ষ্টেশনেই দাণ্ডি ও বাহক কুলি যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা সে দিন কিছুই পাইলাম না। বেলা ৮টা পর্য্যন্ত বাবা অনেক অনুসন্ধান করিলেন; দাণ্ডি যদিও মিলিল, কিন্তু কুলী একজনও পাওয়া গেল না। আলমোড়া হইতে একখানি দাণ্ডি কাকাবাবু বাবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তিন জন আছি। অগত্যা সে দিন আমাদিগকে কাঠগুদামে থাকিতে হইল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ডি এন্ রায়ের বাসা ষ্টেসনের নিকটেই শুনিয়া আমরা তাঁহারই বাটীতে আশ্রয় লইলাম। তাঁহারা আমাদের যথেষ্ট আদর যত্ন করিলেন। তাঁহাদের স্নেহাশ্রয় না পাইলে আমাদিগকে সে দিন বড়ই বিপদগ্রস্ত হইতে হইত। তাঁহাদের সৌজন্য ও অমায়িকতা আমাদের চিরস্মরণীয়। শুনিলাম, অনেক বাঙ্গালী যাত্রী নাইনিতাল, আলমোড়া প্রভৃতি যাতায়াতকালে বিপদগ্রস্ত হইয়া তাঁহারই বাড়ীতে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। কাঠগুদামে বাঙ্গালী অধিবাসী আর কেহ নাই। রায় মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়া আমাদের জন্য দাণ্ডি ও কুলী সংগ্রহ করিয়া দিলেন। শুনিলাম, এ বৎসর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়াতে কুলী এখন পাওয়া যাইতেছে না, সকলেই প্রায় জ্বরে পড়িয়া আছে। যাহা হউক, আমাদের জন্য তিনখানি দাণ্ডি ও ২০ জন কুলী সংগ্রহ করা হইল। একখানি দাণ্ডি ৪ জন কুলীতে বহন করে, এবং দুইজন অতিরিক্ত লোক সঙ্গে থাকে, বদল দিবার জন্য। পার্ব্বত্য চড়াই উৎরায়ের পথে ভার স্কন্ধে বহন করা যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা না দেখিলে অনুমান করা যায় না। সেজন্য একখানি দাণ্ডি ও একজন যাত্রীর জন্য ৬ জন বাহক আবশ্যক হয়। জিনিষ পত্র লইবার জন্য মোটবাহক অপর কুলীর প্রয়োজন হইয়া থাকে।

১৯শে কার্ত্তিক, বুধবার, সকালবেলা কাঠগুদাম হইতে আমরা যাত্রা করিলাম। যত উপরে উঠিতে লাগিলাম, ততই গিরিরাজের মনোমোহন সৌন্দর্য্য দৃষ্টিপথে পড়িতে লাগিল। পথটী বেশ পরিষ্কৃত, এবং কোথাও প্রশস্ত, কোথাও বা অল্প-

পরিসর। পথটী গভর্ণমেন্ট প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। আলমোড়া, রাণীক্ষেত প্রভৃতি পার্ব্বত্য নগর হইতে সর্ব্বদাই লোক এই পথে যাতায়াত করে। পার্ব্বত্য প্রদেশের এটী রাজপথ। বিরাট হিমালয়ের বিশাল বপু বেষ্টন করিতে করিতে পথটী ক্রমশঃ উপরে উঠিয়াছে। পাহাড়ের সকল পথই এইরূপ পর্ব্বতের অঙ্গ বেষ্টন করিয়া নির্ম্মিত হয়। স্থানে স্থানে যাত্রী বা বাহকদিগের বিশ্রামের জন্য ঝরণার ধারে ধারে কয়েকখানি ছোট ছোট দোকান আছে। পরিশ্রান্ত যাত্রিগণ সেখানে বিশ্রাম করে এবং তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জলপান করিয়া লয়; তারপর আবার চলিতে আরম্ভ করে।

বেলা ১২টার সময় আমরা ভীমতালের ডাকবাঙ্গলায় পৌছিলাম। ভীমতাল একটা প্রসিদ্ধ স্থান। নাইনিতাল হইতে অনেক লোক এখানে ভ্রমণ করিতে আসেন। ছোট জায়গা,—কিন্তু বড় মনোরম; চারিদিকে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে এক মাইলেরও অধিক স্থান ব্যাপিয়া একটী বৃহতী পুষ্করিণী—হিন্দী ভাষায় তাল বা তলাও বলে। ইহারই নাম ভীমতাল। তালের উপরে পাহাড়ের গায়ে কতকগুলি বাঙ্গলা নির্ম্মিত আছে; গ্রীষ্মকালে সাহেবেরা আসিয়া তথায় বাস করেন, এবং বোটে করিয়া পুষ্করিণীতে ভ্রমণ করেন। এখন এ স্থানে কেহই নাই। ভীমতাল দেখিবার যোগ্য স্থান। যাঁহারা স্বভাবসৌন্দর্য্য ভালবাসেন, তাঁহারা ভীমতাল দেখিয়া যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিবেন। এখানে সর্ব্বত্রই দুটী করিয়া ডাকবাঙ্গলা আছে দেখিলাম, একটী হিন্দুদিগের জন্য, অপরটী ইংরাজদের নিমিত্ত। ভগবানের কি অদ্ভুত মহিমা! চতুর্দ্দিকে বৃহৎ পাষাণস্তূপের মধ্যে এ নির্ম্মলসলিলা পুষ্করিণী দেখিয়া বিস্ময়ে মুগ্ধ হইতে হয়। বস্তুতঃ পার্ব্বতীয় সৌন্দর্য্য না দেখিলে ঈশ্বরের সৃষ্টিবৈচিত্র্য উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। আমরা হিন্দু ডাকবাঙ্গালায় অবতরণ করিয়া বিশ্রাম করিলাম। বাহকেরা রুটী প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে গেল। আমরা আর রন্ধন করিলাম না, আমাদের সঙ্গে আহারীয় যথেষ্ট ছিল। বাবা ও নির্ম্মলা সামান্য কিছু খাইলেন, আমার সে দিন একাদশীব্রত ছিল। সেই অবসরে নির্ম্মলা ও আমি নিকটস্থ কয়েকটি স্থান বেড়াইতে গেলাম। পুষ্করিণীর জল শেষ হইয়া যেখানে ঝরণার আকারে পর্ব্বতগাত্র বহিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে, সে স্থানটী দেখিলাম, কি সুন্দর! প্রকৃতির লীলানিকেতন দেখিয়া আনন্দে প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল। যে সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা কল্পনাতেও কখন ভাবিতে পারি নাই, বিস্ময়ে আনন্দে বিশ্বস্রষ্টার চরণে ভক্তিভরে হৃদয় অবনত হইল। ডাকবাঙ্গলার নিকটে একটী শিবমন্দির আছে, শিবটীর নাম ভীমেশ্বর মহাদেব। সে স্থানটীও দেখিলাম—বড় পবিত্র, বড় রমণীয়, চারি দিকে পাহাড়ের মধ্যে তরুপল্লবে ঢাকা যেন একটী লতাকুঞ্জের মত।

পাণ্ডবেরা হিমালয়ে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা এখানেও আসিয়াছিলেন। এই ভীমতাল বোধ হয় ভীমেরই কীর্ত্তিনিদর্শন।

বেলা ১২টার সময় আমরা ভীমতাল হইতে যাত্রা করিলাম। যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্য ততই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাহাড়ের ক্ষেতগুলি দূর হইতে দেখিতে কেমন সুন্দর! নিম্ন-ভূমিতে ক্ষেত যেমন চতুষ্কোণাকৃতি হয়, পাহাড়ে তেমন নয়। এখানে পাহাড়ীরা পর্ব্বতের গাত্র গোলাকারে কাটিয়া বহু পরিশ্রমে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এ প্রদেশে আলুর চাষ খুব বেশী; ছাগলের বা ঘোড়ার পিঠে থলি ভরিয়া আলু চাপাইয়া, কৃষকেরা দলে দলে নীচে সহরে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইতেছে, দেখা গেল। দরিদ্র অধিবাসীরা শীতের ভয়ে নীচে নামিয়া যাইতেছে,ঘোড়ার পিঠে জিনিষ পত্র চাপাইয়া, সন্তানদের পিঠে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়াছে। কোথাও দেখিলাম, স্ত্রীলোকেরা শিশুদিগকে ডালার উপর রাখিয়া, ডালাটী মাথায় বহন করিয়া চলিয়াছে। পাহাড়ে চড়াইয়ের পথ কঠিন—বাহকেরা এত শীতেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে লাগিল। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হয়। দাণ্ডি চড়িয়া যাইতে কষ্ট বোধ হইতে লাগিল, আহা! হতভাগ্যেরা পেটের দায়ে কত ক্লেশেই অর্থ উপার্জ্জন করে!

কত বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, কোথাও রৌদ্রতপ্ত, কোথাও ছায়াস্নিগ্ধ হইয়া, খানিকটা পদব্রজে, খানিকটা দাণ্ডিতে বসিয়া, কত চড়াই উৎরাই পার হইতে হইতে আমরা রামগড় অভিমুখে চলিলাম। ক্রমে যত বেলা যাইতে লাগিল, ততই শীতাধিক্য বোধ হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে প্রবল শীতে আমার হাত পা যেন অসাড় হইয়া গেল। তিন চারিখানি কম্বল ও গরম গাত্রবস্ত্র দ্বারা হাত পা বেশ করিয়া ঢাকিয়া কোন রকমে সময় কাটাইতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পর রামগড় হিন্দু-ডাকবাংলায় আমাদের ক্ষুদ্র বাহিনী পৌঁছিল। পথে বাবা বলিতেছিলেন, "রাত্রি হইয়া আসিল, ডাকবাঙ্গালায় যদি পূর্ব্বেই কোন যাত্রী আশ্রয় লইয়া থাকেন, তবে আমাদের বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে।" আমরা গিয়া দেখিলাম, ডাকবাঙ্গলার দালানে অনেক জিনিষ পত্র পড়িয়া আছে; তখনই একটী ভদ্রলোক সেখানে আসিয়াছেন। একটী অশ্ব লইয়া একজন ভৃত্য বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, এখানে জজ সাহেব নামিয়াছেন। শুনিয়াই বাবা প্রমাদ গণিলেন। ডাকবাঙ্গালায় দুটী ছোট ছোট ঘর থাকে, একটীতে জজ সাহেব আছেন। দ্বিতীয়টী আমরা পাইতে পারি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে এত জিনিষ যে, আসবাব রাখিলেই ঘরটী পূর্ণ হইয়া যাইবে, আমাদের তিন জনের আর বিশ্রামের স্থান থাকিবে না। তথাপি নিরুপায় হইয়া আমরা নামিলাম। ইতিমধ্যে জজ সাহেব বাহিরে আসিয়া বাবার পরিচয় গ্রহণ করিলেন,

পরস্পরের আলাপে উভয়েই পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন। তিনি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, বড় সদাশয় ব্যক্তি, সবজজ ছিলেন, এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থায় পেনসন লইয়াছেন। তিনি আলমোড়ার অধিবাসী, অশ্বারোহণে কোথাও যাইতেছিলেন, পথে রাত্রি হওয়ায় রামগড়ে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি, যখন আমাদের আসবাব পত্র দেখিলেন, এবং শুনিলেন, বাবার সঙ্গে তাঁহার কন্যা ও পৌত্রী আছে, তখন তিনি নিজেই বলিলেন, "মহাশয়! একটী ঘরে আপনাদের স্থানাভাবে কষ্ট হইবে, আমি এ ঘরটী ছাড়িয়া দিতেছি, অন্য কোনও স্থানে বা দোকানে গিয়া রাত্রি যাপন করিব।" এই কথা বলিয়া তিনি ভৃত্যগণকে জিনিষ পত্র তুলিতে আদেশ করিলেন। বাবা অনেক নিষেধ করিলেন, পীড়াপীড়ি করিলেন, বলিলেন, "একরাত্রি আমাদের কোন মতে কাটিয়া যাইবে, এত রাত্রে আমাদের জন্য আপনি আর কষ্ট করিবেন না।" তিনি বলিলেন, "আমরা পাহাড়ী লোক, এ প্রদেশের অনেকেই আমায় চেনে, আমার কোন কষ্ট হইবে না।" এই কথা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বাস্তবিক তাঁহার সৌজন্যে আমরা সে দিন অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলাম। তারপর আমরা রাত্রিযাপনের জন্য জিনিষ পত্র খুলিয়া গুছাইয়া লইলাম, কাঠ কিনিয়া আগুন জ্বালা হইল। অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তু সমস্তই আমাদের সঙ্গে ছিল। বাহকেরা দোকান হইতে দুধ আনিয়া দিল, ঝরনা হইতে জল আনিয়া দিল। বাবার জন্য চা প্রস্তুত করিলাম, তারপর খিচুড়ী রাঁধিয়া বাবা, নির্ম্মলা, ও সঙ্গের ভৃত্যটীকে আহার করিতে দিলাম। তারপর বেশ নির্ব্বিঘ্নে আরামে আমরা রাত্রি যাপন করিলাম। প্রথমতঃ একটু ভয় হইতেছিল, পাহাড়ে জঙ্গলের মধ্যে এরূপ নির্জ্জন প্রদেশে পূর্ব্বে আমরা আর কখনও রাত্রিযাপন করি নাই। অন্ধকার রাত্রি, চারি দিক নিস্তব্ধ, বনজঙ্গলের মধ্যে কোথাও মানুষের সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। কোনও একটা বিপদ ঘটিলে কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই। কিন্তু শুনিলাম, পাহাড়ে চোর ডাকাতের কোন উপদ্রব নাই, পাহাড়ীরা সাধারণতঃ চুরি বা প্রবঞ্চনা করিতে জানে না। পূর্ব্বে ইহারা খুব সরল সত্যবাদী ছিল, কিন্তু এখন নীচের সহরের লোকদের সংস্পর্শে তাহারা প্রতারণা ও মিথ্যা কথা প্রভৃতি শিখিতেছে।　　(ক্রমশঃ)

আওরঙ্গজিব আকবরের সমকক্ষ কিনা?

যখন আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে মোগলবৃত্তান্ত পাঠ করি, তখনি দেখিতে পাই যে, আওরঙ্গজিব একজন নৃশংস, হিন্দুদ্বেষী ও প্রজাপীড়ক সম্রাট্ ছিলেন। আর আকবর বাদশাহ অতিশয় ধার্ম্মিক, প্রকৃতিরঞ্জন, ও সর্ব্বজাতীয় প্রজার প্রতি

সমভাবাপন্ন ছিলেন। বাল্যকাল হইতে বিদ্যালয়ে এই বিষয় শিখিয়া আসিতেছি। যদিও কোন কোন স্কুলপাঠ্য ভারতেতিহাসে আওরঙ্গজিবের দুই একটী সদ্‌গুণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তথাপি সে সদ্‌গুণগুলি এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে উল্লিখিত হয় যে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে।

এক্ষণে আমাদিগের দেখা উচিত যে, আওরঙ্গজিবকে আমরা যেরূপ বিষদৃষ্টিতে অবলোকন করি, বাস্তবিক তিনি সেইরূপ ঘৃণার্হ কিনা। সাধারণে তাঁহাকে যেরূপ প্রজাপীড়ক, হিন্দুদ্বেষী ও নৃশংস বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন, তিনি কি যথার্থই সেইরূপ? এ বিষয়ে 'হাঁ' অথবা 'না' উত্তর দিতে হইলে অতি সাবধানে আলোচনা করা আবশ্যক। বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে চাহি যে, (১) আকবরকে যদি ধার্ম্মিক বলা হয়, তাহা হইলে আওরঙ্গজিবকে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। (২) আকবরকে যদি হিন্দুর মিত্র বলা হয়, তাহা হইলে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। তিনি হিন্দুর প্রচণ্ড শত্রু। আওরঙ্গজিব প্রত্যক্ষভাবে কতকটা হিন্দুর শত্রুতা সাধন করিলেও তিনিই যথার্থ হিন্দুর মিত্র। অপ্রত্যক্ষ শত্রু অপেক্ষা প্রত্যক্ষ শত্রুই বাঞ্ছনীয়।

এক্ষণে এ বিষয়গুলি সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করা যাউক। (১) মুসলমান ঐতিহাসিকগণের লিখিত ইতিহাস হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, আকবর বাদশাহ অতিশয় মদ্যাসক্ত ও রমণীপ্রিয় ছিলেন। আইন-ই-আকবরীতেও দেখিতে পাই যে, তাঁহার পাঁচ শত বেগম ছিল। যুদ্ধস্থলেও তাঁহার সহিত শত শত বেগম গমন করিতেন। রাজস্থানের বীরনারীদিগের ন্যায় স্বামীর যুদ্ধে সহায়তা করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার জন্য বা রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া স্বামীসহ পরমানন্দে গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য আকবরের বেগমেরা যুদ্ধস্থলে গমন করিতেন না। তাঁহারা যাইতেন বাদসাহকে সর্ব্বদা কামিনীরূপে মুগ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য। তাঁহারা স্বামীর জন্য প্রাণ দিতে জানিতেন না; কারণ, বাদসাহ কখনও তাঁহাদিগকে অকপটভাবে ভালবাসিতেন না। যতদিন বেগমের যৌবন, ততদিন তাঁহার উপর আকবরের ভালবাসা। আকবরের ভালবাসা কামুকের ভালবাসা; স্ত্রীপুরুষের স্বর্গীয় প্রণয় তাঁহার অপবিত্র হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। বেগমের যৌবন অতিবাহিত হইলেই আকবরের আদেশানুযায়ী তদীয় বেগমকে সামান্যমাত্র মাসহারা লইয়া একজন স্ত্রী-জমাদারের অধীনে থাকিতে হইত। বেচারা বেগমগণ দুই চারি মাসের মধ্যেও একবার স্বামীর চেহারাখানি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন কিনা সন্দেহ। এতদ্ব্যতীত খোসরোজনামক পার্ব্বণে তিনি যেরূপ ভাবে পৃথ্বীরাজ-পত্নীর সতীত্বহরণে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা তড্‌লিখিত রাজস্থানের ইতিবৃত্ত-পাঠকদিগের অবিদিত নাই।

আওরঙ্গজিব জীবনে কখনও মদ্য স্পর্শ করেন নাই। একমাত্র উদীপুরী বেগমই তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে কত শত রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি আকবরের মত সে পাপস্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দেন নাই। এখন চরিত্রবিষয়ে কে শ্রেষ্ঠ তাহা সাধারণেই ভাবিয়া দেখুন।

(২) ধর্ম্মসম্বন্ধে বলিতে গেলে, আকবরকে যে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী বলিব তাহাই স্থির করা কঠিন; তিনি প্রকৃত মুসলমানও নন, হিন্দুও নন, আর খ্রীষ্টানও নহেন; এর আধামাঝি যাহা হউক একটা কিছু বটে।

আওরঙ্গজিব যথার্থ গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই 'কোরাণ-শরিফ' হৃদয়ে জাগরিত রাখিয়া কার্য্য করিতেন। আওরঙ্গজিবের চরিত্র প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর সংস্থাপিত; তিনি মুসলমান ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত; শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তাঁহার মনে সেই ধর্ম্মচিন্তাই প্রবল ছিল; মুসলমান ধর্ম্মের বিস্তৃতিই তাঁর সারা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার প্রতি কার্য্যে আমরা তাঁহার সেই ধর্ম্মভাব দেখিতে পাই। তিনি যা কিছু হিন্দুদ্বেষী কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব বিদ্যমান। আমরা ক্রমশঃ এই বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীকরালী চরণ হাজরা

কমলার পুরস্কার।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

এখন কমলাকে কি কাহারও মনে পড়ে? সুশীলকুমারের পীড়া যে এত সহজে ভাল হইয়া গেল ইহা কাহার গুণে? কুসুমে কমলার দেহসৌরভের সামান্য ছিল বলিয়াই অমিয়া এরূপ যাদুমন্ত্রের ন্যায় মাতুলের পীড়া আরোগ্যের কারণ হইয়াছিল। পুত্রের আরোগ্যবার্ত্তা শ্রবণে আনন্দগদ্গদচিত্তে মাতা সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং পুত্রের শান্তভাব দর্শনে উদ্দেশে ভগবৎপদে ভক্তি-অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং দাসদাসীগণকে, গ্রামে যে সকল দেবমন্দির আছে, সকল স্থানে নানাবিধ উপচারে পূজা পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রতিপালিত হইল। বাটীতে সকলেই আনন্দিত। সুবাসিত তৈলে সুশীলকুমারের কেশ ও দেহ সিক্ত করা হইল। তৎপরে সুশীলকুমারের ভগ্নী আসিয়া স্বহস্তে ভ্রাতাকে স্নান করাইয়া দিলেন। সুশীলকুমারের দেহকান্তি পুনরায় ফুটিয়া উঠিল। কাচনিবদ্ধ কোনও ছবির উপরের ধূলিরাশি অপসারিত করিলে ছবিখানি যেমন উজ্জ্বল ও সুন্দর দেখায়, সুশীলকুমারের সদ্যঃস্নাত দেহখানিও সেইরূপ দেখাইতে লাগিল। তিনি এক দিনেই যেন সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

সুশীলকুমার ক্রমশঃ বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় কমলার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সেই নিদারুণ অপবাদের কথা ভাবিয়া তিনি ম্রিয়মাণ হইলেন।

একদিন অপরাহ্নে একটু ভ্রমণের জন্য বাহির হইতেছেন এমন সময় ডাকের পিয়ন দুইখানি চিঠি আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। একখানি পত্র কলিকাতার তাঁহার জনৈক ইংরাজ অধ্যাপকের। অধ্যাপক সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্টরী পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন ও গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে হাওড়ায় শিক্ষানবীশ ডেপুটীর পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। অন্য পত্র সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির লেখা। পত্রে ইংরাজি ভাষায় কেবল নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি মাত্র লিখিত ছিল।

"মহাশয়, অদ্য হইতে ছয় দিবসের মধ্যে কোন একদিন রাত্রি আট ঘটিকার সময় কলিকাতায় * নং বৌবাজার ষ্ট্রীটের বাটীতে নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে আমি নিঃসন্দেহভাবে কমলার জননী ঠাকুরাণীর চরিত্রের কলঙ্ক মোচন করিতে পারিব। আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না। ইতি

আপনার বিশ্বস্ত
বোস্ এবং ঘোষ,
সলিসিটারগণ।"

পত্রপাঠে সুশীলকুমারের হৃদয়ে এক প্রবল তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল। তিনি আগামী কল্যই কলিকাতা যাইতে মনস্থ করিলেন। মাতা প্রথমে আপত্তি করিলেন, কিন্তু সে আপত্তি টিকিল না। সেক্রেটেরিয়াটে যাওয়া বিশেষ আবশ্যক বলিয়া সকলকে ভুলাইয়া পরদিন মেল-ট্রেনে রাজধানীতে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে গাড়িতে বসিয়া কতই ভাবিলেন। কমলাকে না পাইলে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইবেন, তাহাও স্থির হইয়া গেল।

(৬)

কলিকাতার বৌবাজার ষ্ট্রীটের একটী সুবৃহৎ ত্রিতল বাটীর একটী সুসজ্জিত দ্বিতলের কক্ষে সুশীলকুমার সেই অপরিচিত পত্রলেখকের সাক্ষাৎ পাইলেন। যে সন্দেহে তিনি উন্মত্ত হইয়াছিলেন, অতি সহজেই সে সন্দেহ অপগত হইয়া গেল। কমলার পিতার হস্তলিখিত পত্র এবং ডাক্তারের প্রেশক্রপ্‌সন হইতে প্রমাণ হইল যে, বস্তুতঃ হৃদ্‌রোগেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এক নিশীথরাত্রে কমলার জননী যে যুবকের সহিত কয়েক দিবসের জন্য অন্যত্র চলিয়া যান, সে ব্যক্তি আর কেহই নহেন, তাঁহার স্বামীর প্রিয় সুহৃদ্ ও গুরুদেব। বিশেষতঃ তিনি একাকিনী তথায় যান নাই, তাঁহার সহোদর এবং পুত্রকন্যাদ্বয়ও সঙ্গে ছিলেন। কমলার পিতা নিতান্ত নিরপেক্ষ ও স্বাধীনচেতা রাজপুরুষ ছিলেন বলিয়া জীবদ্দশায় অনেকগুলি শত্রু করিয়াছিলেন, এবং সেই সকল কাপুরুষ নরপিশাচের দল অনাথা বিধবার যথাসর্ব্বস্ব

হরণ করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং ঐ ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ লোকজন সংগ্রহ করিয়া একটী ডাকাতি করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। গুরুদেব সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার উদ্দেশে বিধবাকে তাঁহার অলঙ্কারাদি মূল্যবান্ সম্পত্তি সহ দিন কয়েকের জন্য তাঁহার আশ্রয়ে থাকিবার পরামর্শ দেন ও কমলার জননী একদিন অতি গোপনে, এমন কি ভৃত্য-গণের অগোচরে (যেহেতু দুই জন ভৃত্য ষড়যন্ত্রকারীদিগের দলভুক্ত ছিল) সমস্ত অলঙ্কার ও ব্যাঙ্কের শেয়ারাদি লইয়া পুত্র-কন্যাসহ গৃহত্যাগ করেন। নদীর পর পারে তাঁহার সহোদর এক শকট লইয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন এবং সকলে যথাসময়ে নির্ব্বিঘ্নে গুরুর আশ্রয়ে উপনীত হন। পরদিন প্রাতে সেই সহোদর বাসায় আসিয়া বাসাবাটী তুলিয়া দেন, ও সমস্ত আসবাব ও জিনিষপত্রের যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করেন। তাহার পরে ভগিনী ও ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীকে লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। ইহাই কমলার জননীর গৃহত্যাগের ইতিহাস। ঐ সময়ে যে অলঙ্কারাদির তালিকা করা হইয়াছিল, সেই তালিকায় কমলার মাতুলের স্বাক্ষর ছিল। সেই তালিকা এবং তাঁহার হস্তলিখিত কয়েকখানি পত্র দেখিয়া সুশীলকুমার সমস্তই অবগত হইলেন। ঐ সকল পূর্ব্ব আততায়ীদিগের মধ্যেই কেহ কমলার মাতুলের পরলোকপ্রাপ্তি এবং গুরুদেবের তীর্থবাসের বিষয় অবগত হইয়া ঐ দুই খণ্ড ছেঁড়া কাগজের সাহায্যে ও আমাদের সমাজের কুসংস্কারের আশ্রয়ে এই সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিল। আরও সন্তোষের বিষয়, ইংরাজী টাইপরাইট পত্রে যে জমীদারের নাম টাইপরাইট করা ছিল, তিনি ঐ পত্র কদাপি দেখেন নাই বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ঐ পত্রও সুশীল-কুমার পড়িলেন।

সুশীলকুমার অমানুষ ধৈর্য্যের সহিত, প্রবীণ বিচারকের অণুকরণীয় গাম্ভীর্য্যের সহিত সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া এই সব দলীল দেখিলেন ও সব কথা শুনিলেন। পরে সেই অপরিচিত ব্যক্তির হাত ধরিয়া বলিলেন "আপনি কে? আমার এরূপ অযাচিত উপকার করায় আমি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি না কি?"

অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার নামের কার্ড একখানি সুশীলকুমারের হস্তে দিলেন। কার্ড পড়িয়া তিনি দেখিলেন, অপরি-চিত ব্যক্তি হাইকোর্টের অন্যতম এটর্ণী মিঃ পিঃ বসু। মিঃ বসু বলিলেন,—"আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি সুকুমারবাবুর এটর্ণী, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আপনাকে ঐরূপ পত্র লেখা স্থির করিয়াছিলাম। সুকুমার বাবুর পক্ষ হইতে পত্র লেখা হইতেছে, এই ভাবিয়া পাছে আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইতস্ততঃ করেন, এই আশঙ্কায় তাঁহার নামোল্লেখ করা হয় নাই। এক্ষণে আপনি অবগত হউন যে, সুকুমার বাবুর পৈতৃক জমিদারী সমস্তই উদ্ধার হইয়াছে, এবং "হগ্ এবং

বুল" কোম্পানীর ব্যাঙ্ক "নিউ মুন ব্যাঙ্ক" কোম্পানীর অঙ্গীভূত হইয়া যাওয়ায় ব্যাঙ্কের টাকাগুলিও সমস্ত পাওয়া গিয়াছে। ফলতঃ এখন সুকুমার বাবু দেশের মধ্যে একজন বড় লোক। গত নূতন বৎসরের উপাধি বিতরণের তালিকায় তিনি রায় বাহাদুর হইয়াছেন। যাহা হউক, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, এবং আপনার সমস্ত সন্দেহ অপগত হইয়াছে। আপনি বিষম রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহাও পরম আনন্দের বিষয়।

সুশীলকুমারের হৃদয়ে আনন্দ ও প্রবল অনুতাপের তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। তিনি যে তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় কমলার জননীর উপর এরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য মনে মনে বড়ই ঘৃণা হইতে লাগিল। কমলার জননী কখনও সেরূপ হইতে পারেন না, তাহা তাঁহার বুঝা উচিত ছিল—কেন তাহা তিনি বুঝেন নাই এই বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে বিষম ক্ষোভ ও মর্ম্মদাহী অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি নীরবে অধোবদনে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মিঃ বসু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সুশীলকুমারের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন, শেষে বলিলেন "সুশীল বাবু, সুকুমার বাবু ও তাঁহার জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি?" "আমার আপত্তি?" সুশীলকুমার বিস্মিত হইয়া বলিলেন "আমার আপত্তি? তাঁহারা কি এই নরাধমকে ক্ষমা করিবেন? আমাকে তাঁহারা ক্ষমা করুন আর নাই করুন, একবার সেই মাতৃস্থানীয়া দেবীর চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আমার একান্তই সাধ। তাঁহারা কোথায়?"

পার্শ্বস্থ কক্ষের দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। সুকুমার জননীর সহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। কমলা পশ্চাতে আসিতেছিল, সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সুশীলকুমার তাড়াতাড়ি উঠিয়া কম্পিতপদে কমলার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গের জন্য নিযুক্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

গৃহচিকিৎসা, পাচন ও মুষ্টিযোগ।

১। সকল প্রকার অজীর্ণে—হিঙ্গু, শুঁঠ, পিপুল, মরীচ এবং সৈন্ধব লবণ এক সঙ্গে বাটিয়া, অল্প গরম করিয়া, উদরে প্রলেপ দিলে সকল প্রকার অজীর্ণ রোগই দূর হইয়া থাকে।

২। সকল প্রকার ফুলা ও বেদনায়—খাঁটি সরিষার তেলে আকন্দ আঠা ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিলে বেদনা এবং ফুলা উভয়ই নষ্ট হইবে।

৩। প্লীহা ও যকৃতের স্থানে ব্যথা হইলে

কিম্বা প্লীহা ও যকৃৎ বড় হইলে তদুপরি খাড়ি লবণ ও শুদ্ধ গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

৪। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে অর্থাৎ আমের দিনে এক প্রকার স্ফোটক হইয়া থাকে, উহা সহজে দূর হয় না। এ অবস্থায় ক্ষুদে নটে গাছ মূল সহিত ২ তোলা লইয়া ৷৷৹ আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহা পূর্ণবয়স্কের মাত্রা।

৫। ক্ষত মাত্রে—শিয়ালকাটা থেঁত করিয়া ঘায়ের মুখে পটী বাঁধিলে সকল প্রকার ঘাই শুকাইয়া যায়।

৬। কামলা রোগে (নেবায়) মধুর সহিত ত্রিফলা ভিজান জল খাইলে এবং ত্রিফলা ভিজান জল চখে দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

নূতন সংবাদ।

১। ফ্রান্সদেশে রেশমের চাষ—ফরাসী গভর্ণমেণ্ট নিজ রাজ্যমধ্যে রেশম চাষের উন্নতিসাধনে মনোযোগী হইয়াছেন। রেশম-কীট উৎপাদনে প্রজাদিগের উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক রেশম-কীট উৎপাদনকারীকে তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন রেশমের পরিমাণের তারতম্যানুসারে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

২। বিকানীরে শিল্পোন্নতি—রাজপুতানার অন্তর্গত বিকানীর রাজ্যের যে শাসনবিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, বিকানীর রাজ্যে দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বিকানীর হইতে গত বৎসর প্রচুর পরিমাণে পশম রপ্তানি হইয়াছিল। তথায় যে সোরা ও কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে পণ্য দ্রব্য উত্তোলিত হয় তাহার সুব্যবস্থা হইয়াছে। নৃপতিগণের এবম্বিধ দেশহিতকর কার্য্য অতীব গৌরবের বিষয়।

৩। বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা বঙ্গমহিলা—শ্রীমতী শোভনবালা রক্ষিত বেথুন কলেজ হইতে বর্ত্তমান সনে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

৪। রাণীর শিকার—বরোদার মহারাণী এখন নীলগিরি শৈলে অবস্থান করিতেছেন। মহারাণীর শিকারে বিলক্ষণ দক্ষতা আছে। সম্প্রতি তিনি সাওসত জঙ্গলে একটী প্রকাণ্ড বাঘ শিকার করিয়াছেন।

৫। রমণী গোয়েন্দা—জর্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট রমণী গোয়েন্দা নিযুক্ত করিতেছেন। বার্লিন সহরে কয়েকজন নব যুবতী এই গোয়েন্দাগিরী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে।

৬। পুলস্তানের সুকীর্ত্তি—ফরিদপুরের অন্তর্গত বাজিতপুর গ্রামে বহুদিন হইতে বিষম জলকষ্ট ছিল। সাধারণের এই কষ্ট নিবারণ জন্য তত্রত্য বালকগণ কৃতসঙ্কল্প হইল। ঐ গ্রামের উত্তরপাড়ার দত্তদিগের একটী অতি পুরাতন অব্যবহার্য্য পুষ্করিণী ছিল। বালকগণ দত্তদিগের অনুমতি গ্রহণ করিয়া পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। ইহারা সকলেই ভদ্র কায়স্থসন্তান। বালকগণ যখন স্বহস্তে মাটী কাটিয়া মাটী-পূর্ণ ঝুড়ি মস্তকে বহন করিতে লাগিল, তখন তাহাদিগের কমনীয় বদনমণ্ডলের উৎসাহপূর্ণ শ্রীদর্শনে দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছিল। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে সুকুমার বালকদিগের এই অভূতপূর্ব্ব কার্য্য দেখিয়া নিম্ন শ্রেণীর অধিবাসিগণ বিস্মিত হইয়াছিল। পুষ্করিণীর দৈর্ঘ্য ৬০ হাত, প্রস্থ ৫০ হাত এবং গভীরতা প্রায় ৬ হাত। এরূপ একটী জলাশয় খনন করিতে অনূন ৩০০ শত টাকা ব্যয় হইত। ভগবান্ এই বালকদিগকে চিরসুখী ও দীর্ঘজীবী করুন।

৭। তারবিভাগের নিয়মপরিবর্ত্তন—এতদিন নিয়ম ছিল যে, কোনও ব্যক্তির নামে কোনও তারের সংবাদ আসিলে ঐ ব্যক্তি যদি প্রেরিত ঠিকানায় উপস্থিত না থাকিত, তাহা হইলে সে যে তার আফিসের ঠিকানায় আছে তথায় বিনা মাশুলে ঐ তারের সংবাদ প্রেরিত হইত। সম্প্রতি নিয়ম হইয়াছে যে, অতঃপর লিখিত ঠিকানায় ঐ ব্যক্তির দেখা না পাইলে সে যে স্থানে আছে তথায় সংবাদ "রিডাইরেক্ট" অর্থাৎ পুনঃ প্রেরণ করিতে হইলে স্বতন্ত্র মাশুল দিতে হইবে। ১লা জুন হইতে এই নিয়মে কার্য্য চলিতে থাকিবে।

৮। শুনা যাইতেছে, নির্ব্বাসিত নয় জনের মধ্যে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ দ্বিতল গৃহে বাস করিতেছেন। নিম্নতলে প্রহরীদের বাস। ইনি ইচ্ছা করিলে প্রহরীগণকে নিজের কাজেও নিযুক্ত করিতে পারেন। অধিকন্তু ইনি বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিবার অধিকারও পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত যে গৃহে আছেন, সেই গৃহের দ্বার সমস্ত দিনই উন্মুক্ত থাকে। ইনি বহুমূত্র পীড়ায় পীড়িত; পরিশ্রম করিবার অধিকার চাহিয়াছিলেন, পাইয়াছেন। ইনি ইচ্ছামত বাগানের কাজ করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের গৃহ সর্ব্বদাই তালাবদ্ধ থাকে।

৯। লর্ড কর্জ্জনের বক্তৃতা—গত ২১শে মে ইটন কলেজ সংশ্লিষ্ট মিঃ ওয়েভারবরনকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার নিমিত্ত এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে একটী স্বর্ণ পদক প্রদত্ত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে বক্তৃতাকালে লর্ড কর্জ্জন বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস আরও অধিক পরিমাণে আলোচিত হওয়া উচিত; কারণ, ভারত শীঘ্রই জনসাধারণের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ভারতের শাসনব্যাপারে যতই সংস্কার ও পরিবর্ত্তন হউক না কেন,

ভারতশাসনব্যাপারে ভারতবাসীকে যতই অধিকার প্রদান করা হউক না কেন, তাহার ফলে ভারতের শাসনকার্য্য উত্তরোত্তর জটিল ও কষ্টকর হইয়া উঠিবে মাত্র।

১০। হাইকোর্টের নূতন জজ—হাইকোর্টের অন্যতম দেশীয় বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত লালমোহন দাস অসুস্থতা নিবন্ধন এক মাসের অবকাশ লইয়াছেন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার স্থানে অস্থায়ীভাবে বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার হইতে কার্য্যভার গ্রহণপূর্ব্বক মাননীয় বিচারপতি মিঃ রিচার্ডসনের সহিত দেওয়ানী আপীলসমূহের বিচার করিতেছেন।

বামারচনা।

নববর্ষ-আবাহন।

এস—নবীন বর্ষ! লইয়া হর্ষ,
নব——সাহস, উদ্যম, বুদ্ধি।
পূত——একতা, ভক্তি, চরম শক্তি
মহা——জাগ্রতি, সাধনা, শুদ্ধি।
যাক——ভীতি, সে ভ্রান্তি, অসুখ শ্রান্তি;
যত——আলস্য, জড়তা, সুপ্তি।
হোক——মঙ্গল, পুণ্য, ভেদত্বশূন্য,
যাক——বিদ্বেষ, গোপন গুপ্তি।
দুঃখ——চূরিয়া তূর্ণ, আনন্দপূর্ণ,
কর——নিখিল ভাম্য এ ভূমি।
যত——দেবের শুভ আশীষ ধ্রুব,
তব——কল্যাণে আসুক তূর্ণী!!
তব——নবীন অঙ্গে, রঞ্জিত রঙ্গে,
ভানু——এনেছে অরুণদীপ্তি।
লয়ে——কুসুমবধূ, সুরভি মধু
তোমা——দানিতে এনেছে তৃপ্তি।
আজি——প্রভাতে তব, আগমে নব,
বায়ু——ব্যজন করিতে মত্ত।
ওই——ললিত ছন্দে, বিহগ বন্দে,
এস——বরষ বিধির দত্ত।

শ্রীসুনীলা সুন্দরী মিত্র।

ভুল।

খোকা বুঝি করেছিল ভুল
ছিল না'ত মরতের সে যে স্বরগের ফুল।
নন্দনকাননজাত
সুকোমল পারিজাত,
অঙ্গের সুবাসে তার দেবতা আকুল,
সে যে ছিল স্বরগের ফুল।

দিবানিশি হর্ষভরে
আদরে হৃদয়ে ধ'রে
চাঁদ-মুখে চুমা খেত দেবাঙ্গনাকুল,
খোকা বুঝি করেছিল ভুল।

স্নেহেতে লইয়া কোলে
অপ্সরা কিন্নরী দলে—
আনন্দে বাজাত বীণা এলাইয়া চুল,
খোকা ছিল স্বরগের ফুল।

খোকা যে বাসিত ভালো,
বিমল চাঁদের আলো,
বুকেতে রাখিত তারে শশিতারা-কুল
খোকা বুঝি করেছিল ভুল।

পাইলে কুসুমহার
বড় সুখ হ'ত তার,
সুরবালা গেঁথে দিত তাইতে বকুল;
সে যে ছিল স্বরগের ফুল।

শীতল সলিলরাশি
পেলে খোকা হ'ত খুশী,
মন্দাকিনী বয়ে তাই যেত কুল্ কুল্
এসেছিল স্বরগের ফুল।

মধুর বাঁশীর তান
ভাল সে বাসিত গান;
আনন্দে গাহিত তাই বিহঙ্গমকুল,
সে ছিল যে স্বরগের ফুল।

বুঝি বা মনের ভুলে
এসেছিল ধরাতলে,
অমরার ফুল শিশু মরতে অতুল,
খোকা মোরে করেছিল ভুল।

ধরণীর তাপে শেষে
গেছে আপনার দেশে,
সহসা বুঝিয়া হায় আপনার ভুল;
এসেছিল ধরাতলে স্বরগের ফুল।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।

ভক্তি-উপহার।

(কোচবিহারের মহারাণীর প্রতি)

(সুনীতি কলেজের ১৯০৯ সালের পুরস্কার বিতরণোপলক্ষে।)

বরষের পরে প্রফুল্ল অন্তরে
এসেছি আবার আমরা সকলে,
এসেছি উচ্ছ্বাসে এসেছি উল্লাসে
এসেছি আমরা দুঃখী কন্যাদলে।
এসেছি আবার শুনিয়া তাঁহার
নূতন আশার নূতন আহ্বান;
এসেছি ছুটিয়া সকলে মিলিয়া
করিতে তাঁহার মহিমার গান।

কৃপায় তাঁহার হৃদয় সবার
নূতন ভাবেতে জাগিল আবার;
নূতন পরাণে নূতন মিলনে
গাইব নূতন মহিমা তাঁহার।
তাঁর ডাক্ শুনে দুঃখী কন্যাগণে
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলেছি হেথায়;
তাঁর ডাক্ শুনে আজি শুভ দিনে
এসেছি আমরা গভীর আশায়।

তাঁহারি আদেশে তুমি এই দেশে
রয়েছ কতই গুরু ভার করে;
সিন্ধুপার হ'তে ভারতভূমিতে
এনেছ অনেক ভাব আমাদের তরে;
এনেছ সুনীতি সভ্যতা সুরীতি,
এনেছ আনিবে কত স্নেহের অন্তরে।

তাঁহারি ইচ্ছায় তাঁহারি কৃপায়
আজি আমাদের শুভ সম্মিলন;
আজি সবে মিলি উচ্চরব তুলি
করিব তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন।

আজি প্রাণ ভরে প্রফুল্ল অন্তরে
বলি সবে আজি সৌভাগ্যের কথা;
বলি আজি সবে বলি উচ্চ স্বরে
আমাদের আজি আশার বারতা,

বলি বিশ্ব জনে উচ্ছ্বসিত মনে
আমাদের আজি বড় শুভ দিন;
আমাদের তরে স্নেহের অন্তরে
রাজরাণী আজ সবে সমাসীন।

বিধানের লীলা বিধানের খেলা
বিধানের এই মহিমা প্রকাশ;
বিশ্বাসী মানবে দেখ আজ সবে
বিধানের এই উন্নতি উচ্ছ্বাস।

এ দৃশ্য এদেশে পূর্ব্ব ইতিহাসে
এ চিত্র কখন হয়নি অঙ্কিত;
এ চিত্র কখন এরূপ মিলন
পূর্ব্ব ইতিহাসে হয়নি কীর্ত্তিত।

এ দেশের তরে স্বর্গ হ'তে পরে
আসিল করুণা তাঁহার অশেষ;
এদেশের তরে ভক্তের ভিতরে
আসিল তাঁহার আলোক আদেশ।

আজ সে আদেশ করুণা বিশেষ
সাক্ষ্য দিই মোরা দীনা কন্যাগণে;
সাক্ষ্য দিই সবে বলি উচ্চরবে
তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ ভক্তের জীবনে।

আজ ব্রহ্মানন্দে অপার আনন্দে
প্রত্যাদিষ্ট ভক্তে করি নমস্কার;
আজ মহারাণী মোদের জননী
নমি তব পদে নমি শতবার।

তোমার হস্তের তোমার স্নেহের
তোমার প্রদত্ত লই পুরস্কার;
বৎসরের পরে সবার উপরে
বিধাতারে সবে করি নমস্কার।

স্নেহের ছাত্রীগণ।

ভক্তি-উপহার

(কোচবিহারের মহারাজের প্রতি)।

(সুনীতি কলেজের ১৯০৯ সালের পুরস্কারবিতরণোপলক্ষে।)

আবার বরষ পরে রাজদরশন,
আবার মোদের আজ্ বড় অধিকার,

আবার তোমারে আজ্ নমিছে রাজন্
পিতৃসম হও তুমি মোদের সবার।

সে দিন পাশ্চাত্যভূমে হিমানী-প্রদেশে
ছিলে তুমি সিন্ধুপারে সুদূরে রাজন্!
আজ তুমি আসিয়াছ কত ভাল বে'সে
দুখিনী কন্যার দলে পিতার মতন।

ভুল নাই তুমি এই দুঃখী কন্যাগণে
ছিলে যবে তুমি দূর সাগরবেলায়,
ভুল নাই তাই তুমি আসিয়া এখানে
এসেছ মোদের তরে এসেছ হেথায়।

জানিনাক আজ মোরা কি দিব তোমায়,
জানিনাক আমাদের কি আছে সম্বল,
জানিনাক কি লইয়া এসেছি হেথায়
আছে আমাদের শুধু ভক্তি-অশ্রুজল।

তাই দিই আজ মোরা চরণে তোমার,
তাই দিই সবে মিলে প্রফুল্ল অন্তরে,
তাই দিই আমাদের—যা আছে দিবার
তাই দিই তব পদে সবে ভক্তিভরে।

কত ভালবাসা তব দুঃখী কন্যা তরে,
দিবে তুমি আমাদের স্নেহ-পুরস্কার
তোমার স্নেহের তরে কৃতজ্ঞ অন্তরে
তব পদে সবে মিলে করি নমস্কার।

আমাদের শিক্ষা তরে উদ্যম উৎসাহে
কত অর্থ ব্যয় তুমি করিছ রাজন্!
সুখ্যাতি তোমার সবে দেশে দেশে কহে
কি বলিবে তব গুণ দুঃখী কন্যাগণ?

পাশ্চাত্য দেশের নীতি পাশ্চাত্য শিক্ষার
যা কিছু সুন্দর তুমি আনিতেছ হেথা,
পাশ্চাত্য ভূমির কত সমাজসংস্কার
আনিতেছ সভ্য রীতি সুরুচি সুপ্রথা।

এ সব তোমার তরে আসিছে হেথায়,
এ সবের মূলে তাঁর ইচ্ছার পালন,
এ সবের মূলে আজ দেখি যে তাঁহায়
আদেশ পালন হেতু যাঁর আগমন।

আদেশ-বাদীর তুমি আদরের অতি,
আদেশের সাক্ষ্য তাঁর তোমার জীবনে,
আদেশে তাঁহার তব আদর্শ প্রকৃতি,
চির দিন মোরা তাই রাখিব স্মরণে।

আদর্শে তাঁহার এই মাতা মহারাণী
চলেছেন তব সাথে জীবনের পথে,
তোমাদের জানি মোরা জনক জননী
চলেছি আমরা সবে পশ্চাতে পশ্চাতে।

ধন্য আজ মহারাজ তব দরশনে!
ধন্য আজ আমাদের দীনা ভগ্নীদল!
ধন্য মোরা শত মুখে বলি সর্ব্বজনে
আমাদের সাধ আজ হইল সফল।

স্নেহের ছাত্রীগণ।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।